মরণের ডঙ্কাবাজে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য—এক টাকা বার আনা মাত্র

[illegible]

এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
"শ্রীবঙ্কিম প্রেস", ১১৮/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট্
হইতে মুদ্রিত।

মরণের ডঙ্কা বাজে

চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল ষ্টীমার ছাড়চে। বহু লোকজনের ভিড়, পুজোর ছুটীর ঠিক পরেই, বর্ম্মাপ্রবাসী দু'চারজন বাঙালী

পরিবার রেঙ্গুন ফিরচে। কুলীরা মালপত্র তুলচে, দড়াদড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি,, হৈ হৈ, ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা

আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি, কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই! সবে সে চাকরীটা পেয়েচে, একট বড় ঔষধ ব্যবসায়ী ফার্ম্মের ক্যান্‌ভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ী হুগলী জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ীর ইট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ায় চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বরেরা। কোনো উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা—নইলে কোন্ কালে উঠে গিয়ে সহর বাজারের দিকে বাস করতো ওরা।

সুরেশ্বর বি, এস, সি পাশ করে এতদিন বাড়ীতেই বসে ছিল। চাকুরী মেলা দুর্ঘট আর কেই বা করে দেবে—এই সব জন্যেই সে চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেন্‌সন্ নিয়ে বাড়ী এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেনসন্—সে আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়, কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। সহরে সে আয়ে চলে না। বছর খানেক বাড়ী বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন, তার সমবয়সী এমন কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর আর কোনদিকে সাড়াশব্দ নেই।

ক্রমশঃ এ জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি চালায়, তবুও তো সহরে সে থাকতে পারবে এখন।

আজ মাস পাঁচ ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে। এতদিন এক আধটা টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকুরিটা পেয়েচে, তারই এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে ও সুপারিশে। সঙ্গে তিন বাক্স ঔষধ পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্ম্মের মোটর গাড়ী ওকে চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকুরী এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া—সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদ মেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে—সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুণো ও নিরীহ ধরণের মানুষ—তার মত লোক নিরাপদে চাকুরী করে আর দশজন বাঙালী ভদ্রলোকের মত নির্ব্বিঘ্নে সংসার ধর্ম্ম পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে—তাও যে সে বিদেশ নয়, সমুদ্র পারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে—সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকুরী থাকে না। সে চায়নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে অন্য চাকুরীর চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিকাল গার্ডেন, দুই-তীরব্যাপী কল কারখানা

পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেচে। ভোর ছ'টায় জাহাজ ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেচে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক চেয়ার পেতে গল্পগুজব জুড়ে দিয়েচে, ষ্টীমারের একজন কর্ম্মচারী সবাইকে বলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এসে বল্লে—আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছু দেবো ?

সুরেশ্বর সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এ খবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরৎ দিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—না, কিছু দরকার নেই। বয় চলে গেল।

এমন সময়ে কে একজন বেশ মার্জ্জিত ভদ্র সুরে ওর পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞাসা করলে—মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালী ?

সুরেশ্বর পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিস্ময়ে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেক চেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে তাকে এই প্রশ্ন করছে। তার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, একহারা দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—সবশুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ। সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে লোকটি হাসিমুখে বল্লে—কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই ক'দিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারিনি আপনি বাঙ্গালী কি না।

সুরেশ্বর হেসে বল্লে—এর আর মনে করার কি ? ভালই তো হোল। আমার পক্ষেও। সেকেণ্ড ক্লাসে আর বাঙালী নেই ?

—না, আর যাঁরা যাচ্ছেন—সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন—রেঙ্গুনে ?

—আপাততঃ তাই বটে—সেখানে থেকে যাবো সিঙ্গাপুর।

— বেশ, বেশ, খুব ভাল হোল।

আমিও তাই, সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজেরই মুখে অনেক কথা শুনলে। ওর নাম বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে ডাক্তারী করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ী কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। সিঙ্গাপুরে ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু ব্যবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্ত্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হোল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশ্‌গুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্যি সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি ধরে; এক সময়ে সে রীতিমত ব্যায়াম ও কুস্তি করতো, তারপর গ্রামে অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করতো বলে হাত-পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্ম্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারূপ গল্প করচে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বল্লে—আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মণ্ড হারবার ছাড়িয়েচে এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

মরণের ডঙ্কা বাজে

সাগর পয়েণ্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা ষ্টীমলঞ্চে কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর পয়েণ্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র—কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না—ঈষৎ ঘোলা ও পাট্‌কিলে রঙের জলরাশি চারিধারে। সন্ধ্যা হয়েচে, সাগর পয়েণ্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলচে, কতকগুলো সাদা গাংচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়চে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করচে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভার-কোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যোৎস্না রাত। ডেকের রেলিংএর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েচে, সুরেশ্বরের মন এই সন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ীর কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপ মায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন্ প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্ব্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরণের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকুরীর খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মত ঘরকুণো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোনো দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে। তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারী আরম্ভ করে দেবে—এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁচজনে দেশে বাস করচে, সে না হয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দুজনেই জানতো না একটা কথা।

তারা জানতো না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারী ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না—তাদের অদৃষ্ট তাদের দু'জনকে এক সঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদ সঙ্কুল পথ যাত্রায় এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত সুরে ডাক দিয়ে বল্লে—চট্ করে চলে আসুন, দেখুন কি একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীয়মান মৎস্য দেখলে—ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে। মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়চে—ওরা কেন, সবাই। এ অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য! শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েচে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়চে, কত কি মন্তব্য করচে। ওরাও নাম পড়লে—একখানার নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোন মানে হয় না—কিলাওয়াজা—অন্ততঃ ওরা তো কোন মানে

খুঁজে পেলে না। একখানা জাপানী এন্, ওয়াই, কে লাইনের জাহাজ হিদ্‌জুমারু, উদীয়মান সূর্য্য আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দুদিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র পীড়ায় কাতর হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েচে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে তলায় না, দিন রাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের ষ্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কি বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকুরী! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোষায়? দিব্যি ছিল, বাড়ীতে খাচ্ছিল, দাচ্ছিল। চাকুরীর খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কি ঝকমারি দেখো তো!

বিমল কিন্তু আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ফূর্ত্তিতে শিস্ দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে—হোয়াট্ এ গুড্ সেলার্ ইউ আর!

তিনদিন দুইরাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফেণ্ট পয়েণ্টের লাইট হাউস দেখা গেল।

বেলাভূমি যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশঃ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে, ডাঙা বেশী দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন্ বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিয়ে দেওয়া হ'ল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও যেন লাল। সান্ধ্য তারার সঙ্গে চাঁদ উঠছে পশ্চিমাকাশে—ইরাবতী বক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েচে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাত্রে ইরাবতী নদীতে বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট রাত্রে জাহাজে থাকবে ও সকালে ইরাবতী বক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোর বেলায় কেবিন থেকে ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলেচে ইরাবতীর দুই তীরের সমতল ভূমি ও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মত শস্য-শ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘরবাড়ী। তার পরেই রেঙ্গুন পৌঁছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউই রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে বেড়াতে বেরুল।

বেশী কিছু দেখবার সময় নাই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের "পার্সার" বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখচে, বেশ লাগচে ওদের চোখে। লেক, পার্ক ও সোয়েডাগং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি।

মরণের ডঙ্কা বাজে

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বল্লে—দেখ বিমল, কাল রাত্রে বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখেচি—

—কি স্বপ্ন ?

—তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বজরা বা নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে ধরণেব বজরা আমি ছবিতে দেখেচি, ঠিক বোঝাতে পারচিনে এখন।

—তারপর ?

—তারপর ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। খালি ধোঁয়া—বিশ্রী কালো ধোঁয়া····

—আমরা বাঁচলাম তো !

না খসলাম ?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠল। সুরেশ্বব চুপ করে রইল।

বিমল বল্লে—আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চলো দু'জনে সিঙ্গাপুরে গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি ! তুমি তোমার কোম্পানীকে বলে ওষুধ আনাবে। . বেশ লাভ হবে আমি ডাক্তারী করবো।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুই দিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। রেঙ্গুনের মত সমতল ভূমি নয়, উঁচু নীচু যে দিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দ্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সামপান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলে চীনেম্যান।

ওরা সামপানে করে বন্দরে নেমে সহর দেখতে বের হোল। ঘণ্টা হিসেবে দু'জনে একখানা রকশা করলে—ঘণ্টা পিছু কুড়ি সেণ্ট ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়। অনেকগুলো ছোটনদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে সহরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েচে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধান সিঁড়ি, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেচে। বাগানের চারিদিকে নালায় ঝরণার জলস্রোতে কত পদ্মগাছ। মন্দিরের মধ্যে টেওষ্ট ধর্ম্মজ দেবমূর্ত্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্ত্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন্ চীনা দেবতার মূর্ত্তি, ভ্রূকুটী কুটিল, কঠিন রুক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বল্লে—কি, দাঁড়ালে যে— ?

—দেখচো মূর্ত্তিটা ? মুখচোখের কি নিষ্ঠুর ভাব দেখচো ?

মন্দিরের পুরোহিতদিগের জিগ্যেস্ করে জানা গেল ওটা টেওষ্ট রণদেবতার মূর্ত্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বললে—চল এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বল্লে—ওকি !

পাহাড়ের উপরে যাবে না ?

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরলো।

পথে বল্লে—তোমার কি হোল হে সুরেশ্বর? ও রকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন?

সুরেশ্বর বল্লে—কই না, ও কিছু নয়, চলো।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে ভাব দূর হোল না। ভাল করে কথা কয় না, কি যেন ভাবছে। নৈশ ভোজের টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে না।

রাত ৯টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেচে নৈশ ভোজের পরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠলো—উঃ, কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনা দেবতার মূর্ত্তিটা দেখে।

বিমল হেসে বল্লে—আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম কিন্তু, সত্যি, তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মূর্ত্তিটা অবশ্যি খুব কমনীয় নয়, তবুও—

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বল্লে—আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েচি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছুলো। দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুসি হয়ে

উঠল। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন, সমগ্র এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটা প্রধান বন্দর। বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘরবাড়ী—চারিদিকে পিনাংএর মত মাছ ধরবার প্রকাণ্ড আড্ডা। নীল রংয়ে চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন ঝোলানো পাল-তোলা চীনা জাঙ্ক ও সামপানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেচে।

বন্দরে ঢুকবার মুখেই একখানা ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রায় মাঝ দরিয়ায নোঙর করে আছে কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, ষ্টীমলঞ্চ, সামপানে মালয় নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ। বিমলের মনে হ'ল কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বড় বন্দর।

চারিদিকেই বার সমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোটবড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আরও দু'খানা বড় যুদ্ধ জাহাজ ওদের চোখে পড়লো। বন্দরের উত্তর-পূর্ব্ব কোনে তিন মাইলেব পরে বিখ্যাত নৌ-বহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড় বড় ইস্পাতের খুঁটী, বেতারের মাস্তুলে সেদিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেচে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্ব্বগামী সব রকমই জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদুর ধরে পর্ব্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হচ্ছে। যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েচে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলী দিয়ে মালপত্র এনে দু'খান রিক্সা ভাড়া করলে। ওরা দু'জনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানেই উঠলো। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্ম্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল। বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেশ্বর ফিরে এসে দেখলে বিমল বিষণ্ন মুখে ঘরে বসে আছে।

সুরেশ্বর জিগ্যেস করলে—কি হয়েছে? অমন ভাবে বসে কেন?

বিমল বল্লে—ভাই এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হোল? আমি—যা ভেবে এখানে এলুম, তা হবার কোনো আশা নেই। যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগনে ডাক্তার হয়ে এসে বসেচে। আমার কোনো আশা নেই।

সুরেশ্বর বললে—তাতে কি হয়েচে? এতবড় সিঙ্গাপুর সহরে দুজন বাঙ্গালী ডাক্তারের স্থান হবে না? খেপেচ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলচি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোসো। দেখো কি হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হোল তাদের ঘরের বাইরে জানালার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে শুনচে।

বিমল বল্লে ওকে?

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হোল একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বল্লে—ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দু'জনে অনেক রাত পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায়

একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা করলে। বিমল হাজার খানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে। সুরেশ্বর নিজেদের ফার্ম্মকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে।

বড় ডাকঘরের ক্লক টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজলো। হোটেলের চাকর এসে দু'জনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটী ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারী এই আহার্য্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা' অমৃতের মত লাগলো ওদের।

আহারাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্চে, এমন সময় বিমল হঠাৎ উঠে দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বল্লে—কি?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসলো। বল্লে—আমার ঠিক মনে হলো কে একজন জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম না কিন্তু—

সুরেশ্বরের কি রকম সন্দেহ হোলো। বিদেশ বিভূঁই জায়গা, নানারকম্ বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বল্লে সাবধান থাকাই ভাল। দরজা বেশ বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়। রাতও হয়েচে অনেক।

সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তাই অনেক রাত্রে একটা কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসলো।

বিছানার শিয়রের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানালার মধ্যে একটা ছোট টেবিল। টেবিলের দিকে নজর পড়াতে

সুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর ঢিল জড়ানো এক টুকরো কাগজ। এটাই বোধ হয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরাজিতে লেখা রয়েচে—

আপনারা ভারতীয়! যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী। কাল দুপুর বেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে যে বড় ডুরিয়ান ফলের গাছ আছে, তার নীচে অপেক্ষা করবেন দু'জনেই। আপনাদের

দু'জনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতঃস্তত করবেন না। লেখার নীচে কারো নাম সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে। ব্যাপার কি? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

সুরেশ্বর প্রথমে কথা বল্লে। বল্লে—কেউ তামাসা করচে বলে মনে হচ্ছে, কি বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বল্লে—কিছু বুঝতে পারচি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

—কি খারাপ উদ্দেশ্য! আমরা যে খুব বড় লোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেচি। টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কি করতে পারে আমাদের?

সে রাত্রের মত দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বল্লে—চল, যাওয়াই যাবে। এত ভয় কিসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জ্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। দু'জনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারুর হবে না।

দুপুরের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহর ষ্ট্রীটের মোড় থেকে একখানা রিক্‌সা ভাড়া করলে। ম্যাডিসন কোম্পানীর সোডা-ওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিক্‌সা থামিয়ে চীনে রিক্‌সাওয়ালাকে কি জিগ্যেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিক্‌সাওয়ালাকে ইংরেজিতে জিগ্যেস করলে—কি বল্লে তোমাকে হে?

রিক্‌সাওয়ালা বল্লে—জিগ্যেস করলে সওয়ারী কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—তুমি কি বললে ?

আমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর বড় খারাপ জায়গা, মিষ্টার।

বোটানিক্যাল গার্ডেন সহর ছাড়িয়ে প্রায় দু'মাইল দূরে। সহর ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একটা কিসের কারখানা। তারপর পথের দু'ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগান-বাড়ী। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলা দেশের ছেলে হয়েও দেখেনি—কারণ বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী এই সব স্থানের মত উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য্য পৃথিবীর অন্ত কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌছে ওরা রিক্সওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকাণ্ড বড় বাগান, কত ধরণের গাছপালা, বেশীর ভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড় বড় রুটীফলের গাছ, ডুরিয়ান্ পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান্ ফলের গাছের নীচে দিয়ে যেতে পাকা ডুরিয়ান্ ফলের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটী অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখেনি। নিস্তব্ধ দুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কি পাখী ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড় ভাল লাগলো ওদের। অর্কিড হাউস্ খুঁজে বার করে তার উত্তর পূর্ব্ব কোণে সত্যই খুব বড় একটা ডুরিয়ান্ ফলের গাছ দেখা গেল। সে গাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বিমল বল্লে—একটু সতর্ক থাকো। দেখা যাক্ না কি হয়!

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব্ব শান্তি চারিদিকে—ওরা দুজনে ডুরিয়ান্ গাছের ছায়ায় শুক্‌নো তাল পাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মিনিট তিনও হয়নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজী ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটী অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ। তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরাজীতে বল্লেন—আপনারা ঠিক এসেছেন তাহোলে। ইনি মিঃ আ-চিন্, স্থানীয় চীনা কন্‌সুলেট্ অপিসের মিলিটারি অ্যাটাসি। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন বিনিময় শেষ হবার পর চারজনেই সেই ডুরিয়ান্ গাছের তলায় বস্‌লো। সমগ্র বোটানিকেল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জ্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ।

সুব্বা রাও বল্লেন—প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস্ করি—আপনারা দুজনেই উপাধিধারী ডাক্তার তো ?

সুরেশ্বর বল্লে সে ডাক্তার নয়, ঔষধ ব্যবসায়ী। বিমল পাশ করা ডাক্তার।

এ কথার উত্তরে আ-চিন বল্লেন—দুজনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায় ভাবে আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারী ইউনিট গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি, কারণ আইনতঃ বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা

আপনাদের মন্ত্র শিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দুশো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য সব খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কি মত।

সুরেশ্বর বল্লে—যদি রাজী হই, কবে যেতে হবে ?

—এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাসপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গবর্ণমেণ্ট সে ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদেব এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনাবা যদি রাজি হন, আমার গবর্ণমেণ্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুব্বা রাও বল্লেন—জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহব ষ্টীটের বড় পার্কের ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের কাছে আমি ও আ-চিন্ থাকবো। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।
মরণের ডঙ্কা বাজে

ওরা চলে গেলে বিমল বল্লে—কি বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার ?

সুরেশ্বর বল্লে—চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসাবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বল্লে—আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কি বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর ষ্টীটের পার্কের ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের কোণে আ-চিন ও সুব্বা রাওয়ের সাক্ষাত পেলে। ওদের সব কথাবার্ত্তা শুনে

আ-চিন বল্লে—তা হোলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক'দিনে আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকালেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকী ব্যবস্থা আমি করবো। আর এই নিন্—

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চিন ও সুব্বা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো ডলারের নোট।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিষপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দ্দেশমত আবার ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের কোণে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরেই আ-চিন্ এলেন। বিমলকে জিগ্যেস্ কল্লেন—

—আপনাদের জিনিষ পত্র?

—হোটেলেই আছে।

—হোটেলে রেখে ভাল করেন নি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিষপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোট রাস্তাটার ওপর গাড়ী দাঁড় করিয়ে হর্ণ দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে?

—না ধন্যবাদ যা দিয়েছেন যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিতে লাগলো।

আ-চিন এসে ওদের গাড়ীতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কি বল্লেন। সে ট্যাক্সি বড় পোষ্ট অফিসের সামনে এনে দাঁড় করালো।

বিমল বল্লে—এখানে কি হবে?

বিমলের কথা শেষ হতে না হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট্ গাড়ী এসে দাঁড়ালো। ষ্টীয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চিন্ বল্লেন—উঠুন পাশের গাড়ীতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিত মত দু'জন ড্রাইভারে মিলে জিনিষপত্র সব নতুন গাড়ীখানার তুলে দিলে। গাড়ী যখন তীর বেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় বড় রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বল্লে—অত সদরে দাঁড়িয়ে ও ব্যবস্থা করলেন কেন? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে?

আ-চিন্ বল্লেন—কেউ করবে না জানি বলে ঐ ব্যবস্থা। এ সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনস্যুলেট্ আপিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরণে কনস্যুলেটের ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোনো কাজ করতে গেলেই সন্দেহের চোখে লোকে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়লো—নারিকেল শ্রেণীর আড়ালে। সহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ী একটা বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চিন্ বল্লেন—এখানে নামতে হবে।

বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চিন্ বল্লেন—আমি যাই। এখানে নিশ্চিন্তমনে থাকুন। কোন ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকী ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক্ নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বল্লে—এ আবার কি চিজ্ বাবা? ইঁদুর ভাজা টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বল্লে—ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের যখন পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যাস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে।

কিন্তু কেক্‌গুলো ওদের মন্দ লাগলো না। চা পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জ্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটী অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে এক সারি ঝাউ অপরাহ্নের বাতাসে সোঁ সোঁ করছিল। দূরে সমুদ্র বক্ষে অস্তসূর্য্যের আভা পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলী জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরানো বাড়ী—বাপ, মায়ের কথা। জীর্ণ সান বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঁঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনে কি-সব অদ্ভুত পরিবর্ত্তনও ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ঐ গ্রামের খালের ধারটীতে একা পায়চারী করে বেড়াতো ও কি ভাবে কোথায় গেলে চাকুরী পাওয়া যায় সেই ভাব্‌নাতে ব্যস্ত থাকতো। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে!

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুঁদূর প্রসারী শ্যামল সমুদ্র বেলার সান্ধ্য শোভার দৃশ্যে। সে ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো তো স্বর্গ—মাথার ওপরকার নীল আকাশ—এই সবুজ ঝাউয়ের সারি—ঐ সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়—সত্যিই স্বর্গ—

গভীর রাত্রে আ-চীন এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটর আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জ্জন স্থানে ওরা জিনিষপত্র সমেত ছোট একটা জালি বোটে উঠলো। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা

যাচ্ছে—অন্ধকার রাত্রি, নির্জ্জন সমুদ্র বক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগলো।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাঙ্কে উঠলো।

পাটাতনের নীচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিস, চীনা লণ্ঠন, রঙীন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস্ ফুলগাছ—এমন কি ছোট খাঁচাসমেত একটী ক্যানারি পাখী।

আ-চিন্ বল্লেন—কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো।

সুরেশ্বর বল্লে—সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চিন্ গভীর ভাবে বল্লেন—ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক আপনারা সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বল্লে—আপনি তো সঙ্গে যাবেন না—এ নৌকা ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো?

—সে বিষয়ে ভাববেন না। এ চীন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী জাঙ্ক্। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র। জাঙ্কে সে সমুদ্র পার হওয়া যাবে না।

আ-চিন্ বিদায় নেবার পরে নৌকা নঙর ওঠালে। জাঙ্কের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে নৌকা চলেছে—ঘন অন্ধকারে কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন জোনাকীর ঝাঁকের মত জ্বলছে।

বিমল বল্লে—এখান থেকে হংকং সত্তেরোশো আঠারোশো মাইল দূর। এই ভীষণ চীনসমুদ্র—আর এই জাঙ্ক্ তো এখানে মোচার খোলা। প্রাণ নিয়ে এখন ডাঙ্গায় পা দিতে পারলে তো হয়!

সুরেশ্বর বল্লে—এসে ভালো করনি, বিমল। ঝোঁকের মাথায় তখন দুজনেই আ-চিনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন—দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কি করবে? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খোঁজ পর্য্যন্ত করবে না।

বিমল বল্লে—ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর? বাইরে যেয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটা একবার দেখ। ফসফোরেসেণ্ট ঢেউগুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে? মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কি? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষা কে জানে না জানে নৌকায়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হোল না। ক্রমে পূবদিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি সুরু করে দিলে। চীন সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, ভয়ানক সর্ব্বদা চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। আহার বিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকালে এক মস্ত ঢেউএর মাথায় একটা কাটল্ ফিস এসে পড়লো জাঙ্কের পাটাতনে। সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জ্যাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভালো লাগে না। ভাত ও

শুঁটকি মাছের তরকারী। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দুটী বাঙালী যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত তরকারী খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বল্লে—ঝকমারি করেছি এসে, ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাততঃ মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখানা বড় ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেঙ দূরবীণ দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে কি আদেশ দিলে, মাঝি মাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কি?

সুরেশ্বর সারেঙকে জিজ্ঞেস করলে—নৌকা ঘোরাচ্ছ কেন?

সারেঙ দূরের অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বল্লে—ইংলিশ ক্রুজার, মিষ্টার, ভেরি বিগ ক্রুজার—বিগ্ গান—

সুরেশ্বর বল্লে—তাতে তোমাদের ভয় কি? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানতো না সারেঙের আসল ভয়ের কারণ কোনখানে! চীন সমুদ্রে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ সর্ব্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর—বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বার সমুদ্র দিয়ে যে সব যায়—তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্ককে দেখে সন্দেহ হোলেই থামিয়ে খানাতল্লাস করবেই। তা হোলে এ জাঙ্কে যে বে-আইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নীচে লুকানো—তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলো অতিশয় ধূর্ত্ত। যুদ্ধ জাহাজ দূরে থেকে যেমনি দেখা, অমনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে ঝুপ্ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নীচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগলো—

দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলে ডিঙিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বিমল বল্লে উঃ কি চালাক দেখেছ।

সুরেশ্বর বল্লে—চালাক তাই রক্ষে—নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এসে যদি আমাদের ধরতো—বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ্ করার অপরাধে তোমায় আমায় জেল খাটতে হবে, সে হুঁস আছে?

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড ফোকরওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্ব্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ কবে একটা বড কামান তাদের দিকে দাগে—আর ওদের চিহ্ন খুজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাল্লাগুলো মহা উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূর দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্ক শুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

দুপুরের পবে দূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

জাঙ্ক্ গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙব করলে। বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে—এবং এখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড় জাঙ্ক বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছে নোঙর করলে।

বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লো নবাগত

নৌকাখানা দেখে। সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায়—যদিও ভয়ের কারণ যে কি তা সুরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভাল করেই বোঝা গেল।
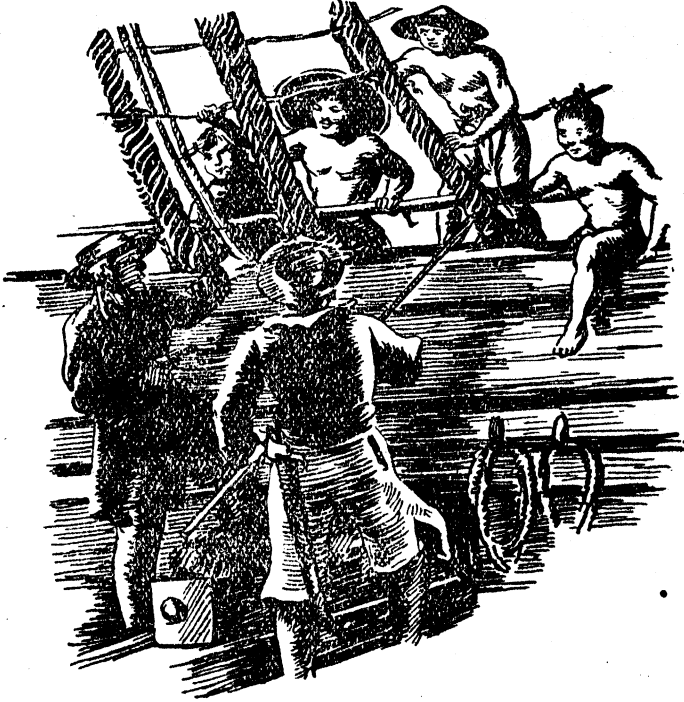
ও নৌকা থেকে দশ বারোজন গুণ্ডা ও বর্ব্বর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাঙ্ক্ ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো হাতে ছোরা।

ওদের জাঙ্কের কেউ কোনো রকম বাধা দিলে না—দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারী, তাছাড়া অত বন্দুক এ নৌকায় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাঙ্কে ওঠালে। বিমল ও সুরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন প্রদত্ত একশো ডলারের নোটখানা পর্য্যন্ত—কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল।

চীন সমুদ্রে বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও সুরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত যুদ্ধজাহাজ হংকংএর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে জড় হচ্ছে—এদিকে সুতরাং বোম্বেটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীনা ও মালয় জলদস্যুরা শুধু লুঠপাঠ করেই ছেড়ে দেয় না—যাত্রীদের প্রাণনষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুরে বা হংকংএ প্রচার করলেই চীন ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। 'মরা মানুষ কোনো কথা বলে না'—এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্ত্তমান দস্যুরা এ নীতি ভাল ভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকায়—যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝি মাল্লার দল সারি সারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। সুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না একজন বদমাইসকে ছোরা হাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠলো।

লোকটা সম্ভবতঃ চীনাম্যান্। বয়স আন্দাদ ত্রিশ, সার্কাসের পালো-

য়ানের মত জোয়ান—নীল ইজের আর একটা বুক কাটা কোর্ত্তা গায়ে মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতের অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে 'ক্রিস্' বলে, তাই। যেমনি চক্‌চকে তেমনি সেখানা ক্ষুরধার বলে মনে হোল।

সে ক্রিস্‌খানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বল্লে—আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে করো না।

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কি কথা বলবে ?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ায় থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুক্‌নো আমচুরের মত কতকগুলো কি জিনিষ তার মধ্যে রয়েছে! বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ জিনিষগুলো কি, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই বা কি—এমন সময় লোকটা একটা শুক্‌নো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে বল্লে—চিনতে পারলে না কি জিনিষ ?

বিমল এতক্ষণে জিনিষটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠলো। সেটা একটা কাটা শুক্‌নো কান, মানুষের কান! লোকটা হা হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লে—বুঝেছ এবার ? হাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক—মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটীর জন্য একটুখানি কষ্ট দেবো। আশা করি মনে কিছু করবে না। এসো, একটু এগিয়ে এসো দেখি।

বিমল নিরুপায়, মুখ দিয়ে একটি কথা বার করবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্ত্তে তার মনে হোল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দ্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্ব্বরদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে !

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চক্‌চকে ক্রিস্‌খানা হাতে করে এগিয়ে এল—বিমলের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল—মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বার হতে চেয়েও হোল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুঁজলে।

তীক্ষ্ণ ক্রীশের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা—কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি ? কিন্তু ক্রিশের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্ত্তে দূব থেকে একটা অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ—প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মত গম্ভীর।

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল—বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল—চাবিদিকে একটি সাড়া, সোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলো পলায়নপর মানুষেব দ্রুত পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কি ব্যাপার ? এ আবার কি নতুন কাণ্ড ?

পরক্ষণেই বিমলেব মনে হোল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকাণ্ড তুলুনি খেয়ে একেবারে কাৎ হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্ত্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠলো—নোঙরের শিকলে কড়্ কড়্ শব্দে টান ধরলো—মজবুত শেকল না হোলে সেই হেঁচকাটানে ছিঁড়ে যেতো নিশ্চয়ই। একটু পরেই বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওব কামরায় ঢুকে হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে।

বিমল বল্লে—ব্যাপার কি বলতো ? আমার বন্ধুটি কোথায় ?

মাঝি বল্লে—সে ভালই আছে।

—বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশী কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েচে। আর অল্প দূরেই সমুদ্রবক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনো দেখেনি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মত একটা জিনিষ নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে—সে জিনিষটা আবার চলনশীল—হালকা রবারের বেলুন বা ফানুষের মত অত বড কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে উত্তব থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

সারেং বল্লে—উঃ কত বড জোড়া জলস্তম্ভ, মিষ্টার! চীন সমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয় বটে. কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি জীবনে কখনো দেখিনি! ঐ জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!

ঐ কালো মোটা থামের মত ব্যাপারটা তাহলে জলস্তম্ভ। ছবিতে দেখেছে বটে, কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা এখনও ওরা ঠিকমত বুঝতে পারে নি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচালে কি করে?

বেশী দেরী হোল না ব্যাপারটা বুঝতে, যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় একশো গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে—তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে ঊর্দ্ধে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে

ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বল্লে—জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিষ, মিষ্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্য্যন্ত বিপদে পড়ে যায়—বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীনসমুদ্রে সপ্তাহে দু-একটা ও বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূর চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র!—

বোম্বেটে জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিক চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বল্লে—মিষ্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু আমরা হংকং যাবো না।

সুরেশ্বর বল্লে—কোথায় যাবো তবে?

—হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান্‌-চাউ বলে একটা ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে বৃটিশ মানোয়ারী জাহাজ আমাদের নৌকা তল্লাস করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে, মিষ্টার।

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান-চাউ পৌঁছে গেল ওদের নৌকা। ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগাগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোট পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গবর্ণমেণ্টের একটা বেতারের ষ্টেশন আছে। সমস্ত দ্বীপে আর কোন অধিবাসী নেই, ঐ বেতারের ষ্টেশনের জন কয়েক চীনা কর্ম্মচারী ছাড়া।

দুদিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্ম্মচারীদের অতিথি হয়ে রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাঙ্কে ওদের দশ মাইল দূরবর্ত্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হোল।

বেতারে এই রকম আদেশই নাকি এসেছে।

এই চীন দেশ! যদি ঢেউ খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ী না থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেতো না।

উপকূল থেকে পাঁচমাইল দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া রৌদ্রে পদ-ব্রজেই ওদের ষ্টেশনে আসতে হোল। এদেশে ওদের জামাই আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই সুরু হোল ওদের—এ কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাড়ে বুঝলে সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধূলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্ম্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল এ সব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থাব গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার দল যা খুসি সুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশী বিদেশীও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিবাপদ নয় আজকাল। দেশ এক প্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জল তেষ্টা পেয়েছিল—চীনা কর্ম্মচারীটীকে ও ইংরাজিতে বল্লে—একটু জল কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর একজায়গায় জড়ো করা মাত্র। চীনা কর্ম্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির

দিকে গেল। বিমলের মনে হোল সেই একবার বৈদ্যবাটীর গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল—এ ঠিক যেন সেই বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী কৈবর্ত্তদের গাঁ খানা। একখানা গরুরগাড়ী সামনেই ছিল—তফাতেব মধ্যে চোখে পড়লো সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। গরুর গাড়ীর অত মোটা চাকা বাংলাদেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হোল। মেয়ে পুরুষ যে যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুলো—এদিক ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্ম্মচারীও তৎপর কম নয়—সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়ালো।

স্ত্রীলোকটি দুহাতে মুখ ঢেকে মাটীতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ব্যাপারটা কি? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠেব আর্ত্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চেঁচিয়ে বল্লে—ওকে কিছু বলো না, মিঃ চংপে—

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কি একটা বল্লে স্ত্রীলোকটীকে। কথাটা এই রকম শোনালে ওদের অনভ্যস্ত কাণে।

—হি চিন্-কিচিন্—চিন্-চিন্—

স্ত্রীলোকটী মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বল্লে—ই চিন্, কি চিন্, সি চিন্—

—কি চিন্, ফি চিন্?

—সি চিন্, লি চিন্।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্ত্তাগুলো যেন ঐ রকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটীর কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন

মূর্ত্তিমতী দারিদ্রের ছবি! ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায় মাথায় তেল দেয়, এরা তাও করে না—গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,—গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী, এই দরিদ্র হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহা চীনের এই ভয়ার্ত্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষীমজুর—এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগলো। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সবদেশে সর্ব্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবি-সিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্রা নারী সমগ্র চীনদেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে—এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হোলে বুকের রক্ত দিয়েও করবে।

স্ত্রীলোকটী এখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড্ আর্ম্মির লোকও নয়। তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই বাড়ীতে, এত গরীব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরীবদের জন্যে নয়।

রেলষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে খুব ভীড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেণ সিন-কিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে—প্রত্যেক ষ্টেশনে আবার নতুন ভর্ত্তি-করা সৈন্যদের ওই ট্রেণেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেণের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো—কোনটায় শুক্‌নো খড় বিচালি ছাওয়া।

বিমল বল্লে—এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেণে, তাই ওরকম করেছে বলে মনে হয়।

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠর হঠর করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরানো আমলের এঞ্জিন বদলে নতুন এঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশ্যি। মাত্র জন আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংরিজি জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা—কিছু দরকার হোলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিগ্যেস করা যায় না যে সেটা কি!

দুপুরের দিকে একটা ছোট সহরে গাড়ী দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বল্লে—ইনি সম্ভব ইংরিজি জানেন, দেখি চেষ্টা করে। তারপরে সে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—গুড মর্ণিং স্যর।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন পর কেউ নেই, তিনি সবারই ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরিজিতে বল্লেন—গুড মর্ণিং, আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বল্লে—সাংহাই। আপনারা কি অনেকদুর যাবেন?

—আমরা যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটী তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হোল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে।

একটু পরে বৃদ্ধের একটী ছাত্র একটী বেতের বাক্স থেকে কি সব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বল্লে—খেওনা বিমল। ইঁদুর ভাজা কিম্বা আরসুলা চচ্চড়ি বোধ হয়।

কিন্তু সে সব কিছু নয়। সরবতি নেবুর রস দেওয়া কুমড়োর বীচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বল্লে, 'প্রোফেসরলি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন। আমাদের সঙ্গে থাকুন না, আমরা যেখানে থাকবো?' হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে গেল—গাড়ীশুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের

দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোন দিক থেকে আওয়াজটা আস্‌ছে।

ছ'খানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পূব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার বেগ হঠাৎ বড় বেড়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্ব্বিকার ভাবেই বসেছিলেন। তিনি বল্লেন—আমাদের গভর্ণমেণ্টের এরোপ্লেন।

একটা ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোকের চারিধার ঘিরে হাসছে—স্ত্রীলোকটীর সামনে একটা শূন্য ফলের ঝুড়ি—এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা খরমুজ।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, আমরা তো নতুন এদেশে এসেছি, কিছু বুঝিনে এ দেশের ভাষা। বোধহয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন না?

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটী ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটলো উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হোলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটতো হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হোতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলো। খরমুজওয়ালী গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিলে—বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পৌঁছুলো।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠলো। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না—খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কি একটা গোলমালের দরুণ ট্রেন ছাড়বাব আদেশ নেই।

এ দেশে সময়েব কোনো মূল্য নেই। চাব, পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে যার

খুসি মত ষ্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়ীতে গাড়ীতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কি জিগ্যেস্ করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান্ মিশনে প্রতি-পালিত হয়েছিল—এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়লো। সারারাতের মধ্যে যে কত ষ্টেশন পার হোল, কত ষ্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল —তার লেখাজোখা নেই। এই রকম ধরণের রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনো করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা একজায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

বিমল ঘুমুচ্ছিল—ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াইতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দুধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না—সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেণ যেন দাঁড়িয়ে— কুয়াশার মধ্যে তার পেছনের গাড়ীর লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলেছে।

প্রোফেসার লিও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বল্লেন—ব্যাপারটা কি।

বিমল বল্লে—সামনে দুখানা ট্রেণ দাঁড়িয়ে এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

ট্রেন থেকে লোকজন নেমে দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে। খুব একটা গোলমাল যেন শোনা যাচ্ছে সামনে।

সুরেশ্বরও উঠেছিল, বল্লে—চলো বিমল এগিয়ে দেখে আসি।

প্রোফেসর লিও নামলেন ওদের সঙ্গে। দুখানা ট্রেনকে ঘন কুয়াশার মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো তা যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ।

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে—কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বল্লেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দণ্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে—দরজা জানালার চিহ্ন বড় একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয়নি। শোনাগেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে—কিন্তু সুখের বিষয় গাড়ীখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেবলভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড় গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর কামরাগুলো এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয়নি।

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেলো। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌঁছুতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই নেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ সহর; সাংহাইএর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরণে তৈরী, বড় বড় বাড়ী, দোকান, হোটেল, আপিস, স্কুল, কলেজ—চীনা ও ইংরাজি ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রীকসা-গাড়ীর ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনাভাতের দোকানে ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রী করছে—এত

বড় সহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই সহরের ওপর বর্ত্তমানে জাপানী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিপিং থেকে।

কিছু বদলায় নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবন যাত্রা সহজ ও উদ্বেগশূন্য ভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসার লি ওদের কাছ থেকে বিদায় দিলেন। খুব বড় ধুসর রংয়ের সামরিক লরীতে চড়ে ওরা একটা বড় লম্বামত বাড়ীর সামনে নীত হোল।

বাড়ীটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরী হোল না—ইউনিফর্ম্ম পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভর্ত্তি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগের চিহ্ন।

দু তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হোল—ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হল্‌দে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হলো না—অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্ম্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরাজিতে লেখা আছে—জেনারেল চু-সিট-টে, অফিসার কমাণ্ডিং নাইন্‌টিন্‌থ রুট আর্ম্মি। ওদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি—জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়লো। বড় টেবিলের ওপাশে এক

সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্ব্বে বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্ত্তমানে জেনারেল চিয়াংকৈ-শাকএব বিশিষ্ট সহকর্ম্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জ্জিত ইংরাজীতে বল্লেন—গুড্‌ মর্ণিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয় নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্য সূচক কথা বল্লে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড় ভালবাসি। আপনাবা আমাদের পর নন।

বিমল বল্লে—আমরাও তাই ভাবি।

—মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ঐ একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের! জেনারেল চু-টে'র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাডীব পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান নেই—তার ওপর ওরা আজ দু'মাস দেশ ছাড়া।

—ভালই আছেন। ধন্যবাদ।

—মিঃ জহরলাল নেহরু ভাল আছেন? আমি তাঁকে শীগগির একটা চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্যে ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠলো। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে, চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চু-টে বল্লেন—আমার এক সময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাবো। নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। ভারতে ভাল বৈমানিক তৈরী হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ঐ ধরণের কিছু আছে—তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চু-টে বল্লেন—আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক্ এই কামনা করি।

বিমল বল্লে—এখন কি আমাদের সাংহাইতেই থাকতে হবে?

—কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান্ ডাক্তার ব্লুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কন্‌শেসনে—সাধারণ সহরে নয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চীন গবর্ণমেণ্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ সহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে—এখানে কারো জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক কন্‌শেসনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

—ইওর এক্সেলেন্সি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, যদি বেয়াদবি না হয়।

—বলুন?

—সাংহাই কি জাপানীরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চু-টে বল্লেন—এ তো আন্দাজের কথা নয়—সাংহাইএর দিকেই তো ওরা পিপিং থেকে আসছে। সেন্‌সি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড় করছি ওদের বাধা দিতে। যাতে

উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড় যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে!

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জ্জাতিক কনসেশনে পৌঁছলো। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ্য করলে ব্রিটিশ প্রজা হোলেও ওদের ব্রিটিশ কনসেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসী কন্‌সেশনে নিয়ে যাওয়া হোল! ওদের সঙ্গে দু'জন চীনা সামরিক কর্ম্মচারী ছিল, আবশ্যকীয় কাগজপত্র তারাই দেখলে বা সই করলে।

প্রকাণ্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইন কানুন। হুকুম না নিয়ে কনসেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসী সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্ব্বত্র পাহারা দিচ্ছে। ফরাসী জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা মন্দিরে। ওদের যাবার দুদিন পরে একদল আমেরিকান্ যুবক কন্‌সেশনে এসে পৌঁছুলো—এরা বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়ে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটী তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কনসেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটী মেয়ের নাম এ্যালিস্ ই, হুইটবার্ণ। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী, তেমনি অদ্ভুত ধরণের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি একুশ বয়েস—চোখে মুখে বুদ্ধির কি দীপ্তি!

বিমল তাকে বল্লে—মিস্ হুইটবার্ণ, তুমি ডাক্তারীর ছাত্র ছিলে?

মেয়েটী বল্লে—না! আমি নার্স হবো আন্তর্জ্জাতিক রেড্ ক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

—তোমার বাপ মা আছেন?

—আছেন! আবার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নাম-করা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

—তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

—তাঁদের বুঝিয়ে বল্লাম। জগতে এক হতভাগ্য জাতি যখন এত দুর্দ্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভাল লাগে? আমি আমার সেন্ট্ আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিণ রেড্ক্রস ফণ্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না—তুমিই বলো না মিঃ বোস, পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটুলী নয়।

মেয়েটা বল্লে—আমাকে এ্যালিস্ বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করবো, অত আড়ষ্ট ভদ্রতার দরকার নেই। আমার একখানা ফটো দেবো তোমায়, চলো তুলিয়ে আনি দোকান থেকে।

কন্সেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান্ দোকান। মেয়েটী বল্লে—চলো সাংহাই সহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি—কোনো চীনা দোকানে ফটো তুলবো। ওরা দু পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস কন্সেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপর উঠে একখানা রিক্সা ভাড়া করলে।

কন্‌সেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজিতে ও ফরাসী ভাষায়। সাংহাই সহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও খ্রু হ্যাট পরে চীনা রিক্‌সওয়ালা রিক্‌সা টানছে, কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশী লোক ও বিদেশী দোকান পসারের সারি। সাংহাইএর আসল চীনাপল্লী আলাদা—রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু—এ কথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মধ্যে শুনেছিল।

এ্যালিস বল্লে—চল, চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস্।

রিক্‌সাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বল্লে —সেখানে কেন যাবে? এ সময় সে সব জায়গা ভালো নয়। বিপদে পড়তে পারো। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিসে ধরবে।

এ্যালিস ভয় পাবার মেয়েই নয়। বল্লে—চল, মিঃ বোস্, হেঁটেই যাবো। ওকে বিপদে ফেলতে চাইনে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিক্‌সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে এ্যালিসকে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দুজনের কেউই জানে না।

বিমল বল্লে—একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস! সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হায়রান হবো।

হঠাৎ এ্যালিস্ ওপরের দিকে চেয়ে বল্লে—ও কি ও, মিঃ বোস্? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছো? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোন্‌দিকে বলো তো?

বিমলও শুনলে। বল্লে—গভর্ণমেণ্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমিষে এমন একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হোল, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে।

সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ওপর বিকট এক আওয়াজ হোল —বাজ পড়ার আওয়াজের মত—সঙ্গে সঙ্গে এদিক, ওদিক, সামনে, পিছনে পরপর সেই রকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চুণ, টালি চারিদিক ছুট্‌তে লাগলো। বিরাট শব্দ করে সামনের সেই বাড়ীটার তেতালার ছাদ ধ্বসে পড়লো ফুটপাতের ওপর। বাড়ী-ধ্বসা চুণ সুরকির ধূলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় বিমল ও এ্যালিসকে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মানুষের গলার আর্ত্ত চীৎকার, গোলমাল, গোঁঙানি, কাতর আকুতি অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কাণ্ড।

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধূলির মধ্যে হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইল—ব্যাপার কি? তারপরেই বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে এল এ জাপানী এরোপ্লেনের বোমা বর্ষণ!

এ্যালিস্ কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধোঁয়া ধূলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশঙ্ক কণ্ঠস্বর—মিঃ বোস, এসো—আমার হাত ধরো—বোমা পড়ছে—দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বল্লে—কোথাও নড়ো না এ্যালিস নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছুটবার বা পালাবার পথও নেই পরবর্ত্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফটফট করে

একটার পর একটা ফাটে তেমনি চারিদিকে দুম্ দাম্ শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলার মাটি যেন দুলছে, টলছে ভূমিকম্পের মত—ধোঁয়া, বাড়ী ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্তনাদ—তারপরে সব চুপচাপ বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দুবার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল——বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্ত ভাবেই।

ধোঁয়ায় মিনিট দুইতিন কিছু দেখা গেল না—যদিও গোলমাল, চীৎকার লোক জড় হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের তীব্র হুইসেল বেজে উঠলো একবার—দুবার তিনবার।

ক্রমে ধীরে ধীরে ধূলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস্ বল্লে—চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস্—

সামনে একজায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড় হয়েছে। একটা বাড়ী পড়েছে ভেঙে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্ন ভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়। বাড়ীটা বোধ হয় একটা চীনা স্কুল ছিল—বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা কতক স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুল বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদূর পর্য্যন্ত।

হর্ণ বাজিয়ে দুখানা রেড্ক্রশ এ্যাম্বুলেন্স এল। একটা ছোট ছেলে তখনও নড়ছে—এ্যালিস্ ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো। বিমল একচমক দেখেই বল্লে—কোনো আশা নেই মিস্ হুইটবার্ণ—ও এখুনি যাবে

বিমলের গা তখনও যেন কাঁপছে। জীবনে এ রকম দৃশ্য কখনো দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ।

এ্যালিস্ ও বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না—সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বল্লে—এ্যালিস্, এখন কি করবে? আর কি চীনে পল্লীতে যাবে এখন?

এ্যালিস্ বল্লে—যেতাম কিন্তু এই যে বোমা-ফেলা হয়ে গেল, এর সোরগোল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে তো। কন্‌শেসনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে! সুতরাং চলো ফেরা যাক।

কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের আম্বুলেন্স ছুটোছুটি করছে। চীনা গবর্ণমেণ্টের এ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফট কামানগুলো চারিদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগলো—কিন্তু তখন জাপানী বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাত্তা নেই।

ওরা কন্‌শেসনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওকে বকচো কেন—আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনাপাড়ায় যাবার চেষ্টা করবো। তুমি চলো না, সুরেশ্বর?

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বল্লে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়তো, তার নাম মিনি—মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কন্‌শেসনের গেট্ পর্য্যন্ত এসেছে—এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্ম্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালে।

বল্লে—আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বল্লে—সহর বেড়াতে।

—যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানী যুদ্ধ জাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ সুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে—সেই সঙ্গে জাপানী উড়ো জাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে!

—ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে চলে আসবো।

একথা বল্লে এ্যালিস্—কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। সহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিশ সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কি বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড সহর। এত বড় সহর বিমল দেখেনি—সুরেশ্বরও না। কল্‌কাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনাপল্লীর নাম চাপেই। সে জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিসর নয়—তবে বড় ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান্, ছোট বড় ইঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত তরকারী বিক্রী করছে।

বিমলের ভারী ভালো লাগলো এই চীনাপাড়ার জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ী বসে ভিক্ষে করচে—টাকা-পয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত তরকারী, ওর মুখে এমন একটা উদার ভালবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারী পেয়েছে বলে এত খুসি হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে।

হঠাৎ আকাশে কি একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে

চাইলে। একটা চাপা 'সোঁ-ও ও' শব্দ। মিনি সর্ব্ব প্রথমে বলে উঠলো—এ শেলের শব্দ! সর্ব্বনাশ, এ্যালিস্, চলো আমরা ফিরি—জাপানী যুদ্ধ জাহাজের কামান থেকে শেল ছুঁড়ছে!

দুম্! দুম্!....দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হোল সঙ্গে সঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুটতে লাগলো—ওরাও ছুটলো ওদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়ীতে গোলা পড়ছে। বাড়ীটার সামনের অংশ হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ছে—ইট, চুণ, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেই রকম 'সোঁ—সোঁ—ও—ও' শব্দ!

কাছেই আব একটা জায়গায় গোলা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে সারবন্দী একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস্ বল্লে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধ জাহাজের গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়—এই চীনা পাড়াটা ওদের লক্ষ্য।

কিন্তু ওদের যাওয়া হোল না। এ্যালিসের কথা শেষ হোতে না হোতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠলো এবং একসঙ্গে দু'তিনটী শেলের বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ ও সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট্‌এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হৈ চৈ, আর্ত্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইস্‌লের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে সুরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই

তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সি-ওয়ালার সন্ধান নেই—সে বোধ হয় পালিয়েছে।

চাপেই পল্লীর ওপর কেন বিশেষ* লক্ষ্য জাপানী তোপের, এ কথা বুঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়ীঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়ীঘর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে সামনের পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল! লোকজন আগে যা কিছু মারা পড়েছিল—এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব্দ! এ্যালিস্ বল্লে—দাঁড়াও বিমল—এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লীর অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চীৎকার, হৈ চৈ কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিস আগে চড়লো গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে মিনি ও সুরেশ্বর। বিমল নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোট ঘর। এ্যালিস্ অতি কষ্টে ঘরে ঢুকলো—সুরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন' দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেজেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস্ তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে সুরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইট্‌কাঠের স্তূপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে—আঃ, কোথায় গেলে তোমরা? চট্ করে নেমে এসো—বড় বিপদ!

চারিদিকের গোলা ফাট্‌বার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা 'সোঁ—ও—ও' রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে

আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মত অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ্যালিস্ বল্লে—কি হয়েছে?

বিমল বল্লে—জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে সহরে—তারা সহর আক্রমণ করেছে শুন্‌ছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না—তোমার হাতে ও কি?

মিনি বল্লে—একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বলোতো এখন?

সুরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিশম্যানকে জিগ্যেস্ করে জানলে—সমুদ্রের ধারে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস্ বল্লে—আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বল না? কন্‌শেসনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কন্‌শেসনে নিয়ে গেলে।

বিমল বল্লে—পুলিশম্যানের জিম্মা কবে দাও না।

এ্যালিস্ ও মিনি তাতে রাজি হোল না। এই সব চীনা পুলিশম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট ছেলেকে ওবা দেবে না।

সমস্ত গলিটা একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কি সব খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময়ে পাশের একটা স্তূপে দু' তিনটী হারিকেন লণ্ঠন ও টর্চ্চ জ্বালিযে একদল ছোকরা একটী মৃতদেহেব ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠলো—প্রোফেসব লি! প্রোফেসর লি!

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোক্‌রার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে,

ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন, দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্ব্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষুদের আর্ত্তনাদ ও পথের লোকের চীৎকারের মধ্যে তিনজনের

কুশল প্রশ্ন বিনিময় হোল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্য্যোগ—এখন তিনি

সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাস-পাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস্ ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হোল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটীর কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ, সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বল্লেন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপমায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারবো। আর কি জানো, ছেলে অনেকগুলি জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এস তোমরা—যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠলো....আঃ, কি ব্যাপার দেখ!

সকলেই দেখলে, সে দৃশ্য যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিণী ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে—সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলো রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে। আশার জিনিসগুলো—মুখেও দিতে পারেনি হয়তো!

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে ফেললে। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদেব বল্লেন, এই মড়াটাকে একটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এ আর কি? আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার। এতে বিচলিত হোলে চলে না মাদাম!

নিকটেই একটা ঘরের মধ্যে প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে ঘরের মেঝেতে পাঁচ ছয়টী নয়

দশ মাসের কি এক বৎসরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে।

এ্যালিস্ ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—ও' ইউ পুওর ডিয়ারিজ্! প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটাও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে—আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি—রাখো এখানে।

গোলমাল ও ভিড় তখন একটু কমছে।

প্রোফেসর লি ওদের সকলকে বল্লেন—আসুন, একটু চা খাওয়া যাক—রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এই রকম চলবে দেখছি—যে ঘরে শিশুগুলিকে জড় করা হয়েছে, তার পার্শ্বেই একটা ছোট বাড়ীতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকী সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোট ছোট পেয়ালায় দুধ চিনি বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, সর্ব্বতি লেবুর টুকরো এবং বাঙালী মেয়েদের পাঁয়জোড়ের মত দেখতে, শূওরের চর্ব্বিতে ভাজা এক প্রকার কি খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক ধরণের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বল্লেন—আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখন কিছুই দেখেন নি, দেখলে আপনাদের দয়া হবে। এত গরীব দেশ আর এমন হতভাগ্য—

মিনি বল্লে—আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি?

দেখতেই তো এসেছি—

এ্যালিস্ বল্লে—আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুঃস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে—বড় ভাল লাগলো এই বিদেশিনী বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস্ বল্লে—শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিট্‌ল মাইটস্।

আমায় একটা খোকা দেবেন প্রোফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—কি করবে মিস্—

এ্যালিস্ বল্লে—আমাদের নাম ধরে ডাকবেন, প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকবো—কেমন?

এই সদানন্দ উদার, সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড় ভাল লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চিনে মাটির হাস্যমুখ বৃদ্ধ—বৃদ্ধের মুখখানা ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি'র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বল্লেন—বেশ তাই হবে।

...একটা বড় রকমের আওয়াজের দিকে এই সময় প্রোফেসের লি'র জনৈক ছাত্র ওদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বল্লে—বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে....

ঠিক এই সময় পুলিশম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনাভাষায় কি

জিজ্ঞেস্ করলে....লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত....সে চলে গেলে প্রোফেসর বল্লেন....ও বলে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়....বিশেষত; মেয়েরা। জাপানীরা বেওনেট চার্জ্জ করেছিল....আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনস্থ প্রাচীরের পূর্ব্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রে আবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুঁড়বে।

চা পান শেষ হোল। বিমল বল্লে....প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কন্‌শেসনে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস্ বল্লে....দাদু, আমার একটা খোকা ?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সস্নেহে বল্লেন....বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস্। কিন্তু কি কি করবে চীনা ছেলে নিয়ে ?

এ্যালিসের এ হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

....চল চল এ্যালিস্ কন্‌শেসনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতেই দেবে কি ?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুম্‌দাম্ বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের শাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেলে....সে ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসলো....কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রি গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে....সুরেশ্বর....সুরেশ্বর....ওঠো....কন্‌শেসনে বোমা পড়ছে !

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈ চৈ উঠলো চারিদিকে।

বোমা! বোমা!"

ওরা জানালা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়ে ছিল —তার পূবদিকে একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস্ ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে—বিমল! বিমল!

বিমল বল্লে—এই যে এ্যালিস, তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকলো। বল্লে—বাইরে এসো, দেখো শীগগির—চট্ করে এসো—

ওরা বাইরে গেল। কন্‌শেসনের পুলিশের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দুখানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে—আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসী কর্ম্মচারী দেখে বল্লেন—কাওয়াসাকি বম্বার।

বিমল বল্লে—এ্যালিস, কি করে চেনা গেল জিজ্ঞেস করো না?

মিনি বল্লে—আমি জানি। নীচের দিকে উইং কালো আঁজি কাটা ছুঁচোমুখ প্লেন্ এই হোল জাপানীদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কন্‌শেসনে বোমা! এরকম তো কখনো—

সে রাত্রে আর কারো ঘুম হোল না। বিমল খুব খুসি না হয়ে পারলে না তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস সকলের আগে এসেছে তাকে দেখতে সে কেমন আছে?

শেষ রাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু খুব সোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে—সাংহাই সহরে জাপানী যুদ্ধ জাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই সহর থেকে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে পালিয়ে আসছে কনশেসনে, বাক্স তোরঙ্গ পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে, ছোট, ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন—এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ ; পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয় !

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কনশেসনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রশের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কি ভীষণ আওয়াজ গোলমাল পেন্‌সু প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব্ব কোণে। সেখানে চীনা টেন্থ রুট আর্ম্মির সঙ্গে জাপানী সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কন্‌শেসন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলা-বর্ষণ চলছে সহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছ থেকে—বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস ও মিনিকে চ্যাংলীন এভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রশ মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটলো। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রশ পতাকা গাড়ীর সামনে উড়িয়ে দিলে—এ ছাড়া গাড়ীর ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড লাল ক্রস্ আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বল্লে—যদি আপনারা, হাসপাতালে পৌঁছুতে পারেন, সে খুব জোর বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বল্লে—কেন ?

—কন্‌শেসন বা রেডক্রশ কিছুই মান্‌ছে না। জাপানী বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেডক্রশ ভ্যানে বোমা ফেলেছে—শোনেননি আপনারা সে কথা ?

সেকথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কন্‌শেসন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে ওপরের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে !

বিমল বলে—কি দেখছো ?

—বোমারু প্লেন আসছে কিনা দেখছি। এখন আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো কিনা জানি নে—তবে চেষ্টা করবো—

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল—সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে ? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার অ্যাক্‌শিলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পীড্ তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেন খানা যেন আরও নীচে নামলো—কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক বা অন্য কারণেই হোক্—শেষ পর্য্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ড্রাইভার বল্লে—জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার—ভীষণ জিনিস—নীচু হয়ে দেখলে এ গাড়ীতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলতো।

সুরেশ্বর বল্লে—উঃ কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে।

এতক্ষণ যেন গাড়ীর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলে সেখানে এত আহত নরনারী এনে

ফেলা হয়েছে যে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। এদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে—তবে তাদের সংখ্যা তত বেশী নয়।

একটী দশ এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে—আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। এ্যালিস্ সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস্ পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখে জল রাখতে পারলে না ছেলেটীর যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বল্লে একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না?

বিমল বল্লে—তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্ম্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভর্ত্তি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবো।

এ্যালিস্ বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ওদের সবারই মুস্কিল চীনা ভাষা সামান্য এক আধটু বুঝতে পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপাতালের ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউণ্ডার হয়েছে। সে দুখানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে যোগার করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস্ বল্লে—সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি মিনি ভালো করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারবো না—

আর্ত্ত বালকটীর শয়নশিয়রে এ্যালিস্‌কে যেন করুণাময়ী দেবীর মতো

দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় ওর মন ভরে উঠলো।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হোল।

বালকটীকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে, কতকগুলি ডাক্তারী ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জ্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কি বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস্ সার্জ্জনকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। সার্জ্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশন টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামাবার তর সয় নি—গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স—

এমন সময়ে মাথার ওপর কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা দৌড়ে ভেতরে এল, একটা ছুটোছুটি সুরু হোল চারিদিকে।

কে একজন বল্লে—জাপানী বম্বার!

এ্যালিস্ বল্লে—রেড ক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে—হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে—

সার্জ্জন হেসে বল্লে—নার্স, ওরা কি কিছু মানছে?—শক্ত করে ধরে থাকো তুলোটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জ্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বুম্-ম্-ম্-ম।—বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল হৈ-চৈ, আর্ত্তনাদ, হাসপাতালের বাঁদিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসিরিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জ্জন, বিমল বা

এ্যালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই—ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জ্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তার অপারেশন টেবিলের থেকে এক শো গজের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড ঘটেনি, যেন তিনি মোটা ফি নিয়ে বড় লোক রোগীর বাড়ী গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত, গরম জলের পাত্রে ডোবান ছুরি, ফর্সেপ্‌, ছুঁচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জ্জনকে যুগিয়ে চলেছে এ্যালিস্, একমনে ব্যাণ্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিণ্ট কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ী ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ—হুড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁ দিকের উইংএর ছাদ ভেঙে পড়লো। মহাপ্রলয় চলেছে সেদিকে—

সার্জ্জন বল্লেন—নাড়ীর বেগ কত?

বিমল—সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—স্যর, বাঁদিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপটিক ওয়ার্ডের রোগী সব চাপা পড়েছে—এদিকেও বোমা পড়তে পারে—তিনখানা বম্বার—

সার্জ্জন বল্লেন—পড়লে উপায় কি? নার্স বড় ফর্সেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! আর একটা শব্দ অন্য কোন্ দিকে হোল—আর একটা বোমা পড়েছে—বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বল্লে—স্যার, ধোঁয়ায় রোগীর দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে-?-ক্লোরোফর্ম্মের রোগী, এভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জ্জন ছুরি ফেলে বল্লেন—হয়ে গিয়েছে। লিণ্ট দাও, নার্স।

বিমল বল্লে—স্যার, রোগীর নাড়ী নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জ্জন এসে নাড়ী দেখলেন। এ্যালিস্ নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ী থেকে হাত নামিয়ে সার্জ্জন গম্ভীর মুখে বল্লেন—বাইশটা পূরলো।

এ্যালিস নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বল্লেন—চলো নার্স, ট্রেচারওয়ালারা এসে লাস নিয়ে যাবে—এখন সবাই বাইরে চলো যাই—

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এলো এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধুম্রলোক থেকে উদ্ধার করে ডান-দিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউণ্ডের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিসকে ব'ল্ল—ঐ দেখ এ্যালিস, তিনখানা জাপানী বম্বার!—

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পরে বিমল, এ্যালিস, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে হয়েছে—রেড্ শার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটী প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে সামিয়ানার নীচে চা ও শূওরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই এভিনিউয়ের ধারেই গভর্ণমেণ্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপাতালের বাঁ অংশে মহা হৈ চৈ চলছে। সেপ্‌টিক্ ওয়ার্ড জাপানী বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে—সম্ভবতঃ একটা রোগীও বাঁচেনি সে ওয়ার্ডের।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল—বিমল বারণ করলে।

—ওদিকে গিয়ে দেখে আর কি হবে মিনি? চলো আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক।

বোমা-ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে দেখে কদিন ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাইএর লোকজন, দোকানী, পথিকদেরও। নতুবা গত আধ ঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয় লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানী বোম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারীর দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস্ জিগ্যেস্ করলে—ছেলেটী মারা গেল, তখন ক'টা?

বিমল বল্লে—ঠিক সাড়ে সাতটা। ওকথা ভেবো না এ্যালিস্। চল আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাস নিয়ে যাওয়ার ভ্যান্ আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা সামিয়ানার নীচে ওরা চা খেতে বসলো।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বল্লে—কি দেবো?

বিমল বল্লে—খাবার কি আছে?

—ভাজা মাছ, রুটী, মাখন আর ব্যাঙের—

—থাক্ থাক্ রুটী মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো—

রুটী মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না; তবে চ্যাং সো লীন্ এ্যাভিনিউর দোকানগুলো কিছু সৌখীন ও বিদেশী-ঘেঁষা। ধূমান্বিত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে।

সুরেশ্বর তো গোগ্রাসে রুটী ও মাখনের সদ্ব্যবহার করতে লাগলো, খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

মিনি বল্লে—একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেণ্টোনে, কালিফোর্ণিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিন্‌চিলা কিনে দিয়েছিলেন—

সুরেশ্বর বল্লে—সে কি?

মিনি হেসে বল্লে—জানো না? একরকম ছোট কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড় জানোয়ার, খুব চমৎকার লোম গায়ে—লোমের জন্য ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমাদের সেই পোষা চিন্‌চিলাটা—

বুম্—ম্—ম্!—বিকট আওয়াজ!

সবাই চম্‌কে উঠলো! তিনখানা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর ওপরে জাপানী বোম্বার ঘুরছে দেখা গেল—কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়ীটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়লো। একটু পরে একখানা রিকসা টেনে দুজন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সাম্‌নে দিয়ে যেতে দেখা গেল—রিক্‌সায় আধ-শোয়া আধ-বসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা থেঁৎলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

সামিয়ানার নীচে আরও তিনটী চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিতভাবে চীনা ভাষায় দোকানীকে কি বল্লে। দোকানীও তার কি জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালে।

জাপানী বোমারু প্লেন ঘর্ ঘর্ শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে। নাঃ একটু দূরে বাঁদিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

মিনি বল্লে—তারপর শোনো, আমার সেই চিন্‌চিলাটা—

এ্যালিস্ অধীরভাবে বল্লে—আঃ মিনি, থাক্ চিন্‌চিলার গল্প। খাও এখন ভাল করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোকানীকে জিগ্যেস্ করো না, স্যাণ্ডউইচ রাখে না?

বিমল বল্লে—ব্যাঙের মাংসের স্যাণ্ডউইচ বলছে এ্যালিস্—দিতে বলবো?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চ্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমান জাপানী বম্বারখানা থেকে রাস্তার যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সেদিকে সার্চ্চলাইট্ ফেলেছে।

দোকানী চীনা স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে উঠে কি বললে।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড় শব্দ—তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জন দুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়লো।

মিনি বল্লে—আঃ এগুলো কি বোকা? টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা, আমার পেয়ালাটা উল্টে ফেলে দিলে মাঝে থেকে—

এ্যালিস্ বল্লে—আমারও। দোকানী, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই—এ কি রকম উপদ্রব?

বিমল বল্লে—ঠিক তো। মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মত—

মিনি হঠাৎ আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্লে—ঐ দেখো, দেখো—

জাপানী বম্বার থেকে সার্চ্চলাইট ফেলেছে—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিন দিকে জাপানী বম্বারখানাকে তাড়া করেছে। একখানা চীনা প্লেন্ বম্বারখানার খুব কাছে এসে পড়েছে—একটু পরেই সেখানা থেকে মেসিন্ গানের পট পট আওয়াজ শোনা গেল—পিছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন্ ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চ্চলাইট ফেলতেই জাপানী বম্বারখানা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দুজন চীনা খদ্দের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানী স্ত্রীলোকটী তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বল্লে—ওই দেখ ওরা ব্যাঙের স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে—

মেসিন গানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে। জাপানী প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বল্লে—না; একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অম্‌নি মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল—পোড়া বরাত এম্‌নি—

একজন ফিরিওয়ালা এসে সামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্লে—মোমের ফুল—খুব চমৎকার মোমের ফুল—গোলাপ, ক্রিসেন্‌থিমাম্‌, গাঁদা—ভারী সস্তা মোমের ফুল—

এমন সময়ে একজন খবরের কাগজওয়ালা 'সাংহাই ডেলি নিউস্‌' বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ কাগজের একদিকে চীনা ভাষায় ও অন্য দিকে ইংরাজী ভাষায় লেখা খবর —চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে এ বেলার যুদ্ধের খবর নিয়ে—সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস্‌ বল্লে—যুদ্ধের খবর কি ?

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগলো। শেনস্থ প্রাচীরের কাছে জাপানী সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানীদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—সর্ব্বৈব মিথ্যা। জাপানীরা জিতছে। ভুল খবর

দিচ্ছে আমাদের , পাছে সহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছো না বোমা ফেল্‌বার কাণ্ড? চীনারা জিত্‌ছে! ফুঃ—

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হোল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেনস্থ প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোকে জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কি। চীনা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্ব্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মত অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয় এইটেই আশ্চর্য্য। এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

কাগজের এক কোণে একটী সংবাদের দিকে মিনি ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক্‌ চাপেই-পল্লীর বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত ন'টার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বল্লে—এখন পৌনে ন'টা।

বিমল বল্লে—তা হোলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনও দেখিনি, দেখা যাবে এখন।

এমন সময়ে ওদের সামনের রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠলো। রাস্তার দুধারে লোকজন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিশম্যান রাস্তার মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ'খানা মোটরকার দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় চীৎকার করে বলে উঠলো মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াংএর জয়! 'টেন্‌থ রুট আর্ম্মির জয়!'

এ্যালিস বল্লে—এই মার্শাল চিয়াং গেলেন!

বিমল বল্লে—তবে আর হাসপাতালে এখন ফিরে কি হবে? চল্ কন্‌শেসনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানী বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—

সুরেশ্বর বল্লে—তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।

কন্‌শেসনে ফিরবার পথে ওদের এক বিপদ ঘটলো।

কন্‌শেসনে ফিরিবার পথে খানিকটা ওরা চ্যাং সো লীন্ অ্যাভিনিউ দিয়ে এসে পড়লো একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দু'খানা রিক্‌সা ভাড়া করে ওরা তাদের কন্‌শেসনে যেতে বল্লে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর করলে তখন দেখলে রিকসা একটা নির্জ্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দুধারে দরিদ্র লোকদের কাঁচা মাটির খাপ্‌রা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্য—দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কি যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বল্লে—এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে' হে?

সুরেশ্বর পিজিন্ ইংলিশে একজন রিকসা-ওয়ালাকে বল্লে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ রে? এ পথতো নয়?

রিকসাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগলো।

বিমলের মনে সন্দেহ হোলো। সে বল্লে—এর মনে কোনো বদমাইসি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—

মিনি ও এ্যালিস্ তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বল্লে—আর

গিয়ে দরকার নেই—চীনা গুণ্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দুখানা রিক্সাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিক্সাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্ব্বেই রিক্সাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বিমলদের রিক্সাখানা কিন্তু তখন সোজারাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চীৎকার সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিকসাওয়ালার ঘাড়ে পড়লো রিক্সা থেকে। রিক্সাখানা উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুরেশ্বর রিক্সার সঙ্গে চীৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রিক্সাওয়ালাটা সেখানে বসে পড়লো—ওর ওপর বিমল।

রিক্সাওয়ালা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীনা ভাষায় কি একটা দুর্ব্বোধ্য কথা বলে উঠে, ওদের নিয়ে এগিয়ে এল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সুরেশ্বর—সাবধান!

রিক্সাওয়ালার হাতে একখানা বড় চক্‌চকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পেছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে। সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হোল। বিমলের রীতিমত শরীরচর্চ্চা করা ছিল। মিনিট পাঁচ ছয়ের মধ্যে রিক্সাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে, বিমল তার হাত মুচ্‌ড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বল্লে—ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর—তারপর এই বদ্‌মাইসটার গলায় বসিয়ে দাও—

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদ্‌মাইসটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়লো—এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্ দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল

পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বল্লে—সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়ীখানা!

তারপর ওরা তুজনেই ছুটলো সেই গলিটার দিকে—যেটার মধ্যে মিনিদের রিক্সাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দুধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালা নীচু নীচু বাড়ি—কিছুদূরে একটা সাধারণ স্নানাগার—এখানে নীচশ্রেণীর মেয়ে পুরুষে সাধারণতঃ স্নান করে না—করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে তু-জন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিগ্যেস্ করলে—একখানা রিক্সা কোন দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বল্লে—ওই বাড়ীটার সামনে একখানা রিক্সা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বল্লে—চল বাড়ীর মধ্যে ঢুকি—

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চণ্ডুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার একদিকে একটী নীচু বাঁশের তক্তপোষ। চণ্ডু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্র, চণ্ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটী লোকশূন্য নির্জ্জন। এ ধরণের চণ্ডুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো লোক বসে মা জং খেলছে।

বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চণ্ডু নয়, নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দুজন লোক উঠে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন কর্কশকণ্ঠে পিজিন ইংলিশে বল্লে কি চাই? কে তোমরা? বিমলের মাথায় চট্ করে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্তৃত্বের গ্রামভারী চালে বল্লে, আমরা ব্রিটিশ কন্‌শেসনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কনেষ্টবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে। দুজন মেম সাহেবকে এই আড্ডায় গুম্ করা হয়েছে—বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করবো। দরকার হোলে গুলি চালাবো।

এবার একজন প্রৌঢ লম্বা ধরণের লোক এককোণ থেকে বলে উঠলো আমরা কন্‌শেসনের পুলিশ মানিনে—সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শ্যালের সই করা ওয়ারেণ্ট দেখাও—

বিমল বল্লে—তুমি জানো এটা যুদ্ধের সময়। আমরা জোর করে ঢুকবো এবং দরকার হোলে এই মা জংএর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেবো—এর জন্যে যদি কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিশ মার্শ্যালের কাছে আমরা দেবো—তুমি মেম সাহেবদের বার করে দেবে কি না বলো—

লোকটা বল্লে—কোন্ মেমসাহেবের কথা বলছো? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমি ভাবছিলাম, তুমি জুয়া আর চণ্ডুর আড্ডা হিসেবে বাড়ী সার্চ্চ করবে বলছো।

বিমল বল্লে—বেশী কথায় সব নষ্ট করতে চাইনে—তাহোলে আমাদের জোর করতে হোল—সুরেশ্বর কনষ্টেবলদের ডাকো—

হঠাৎ চীৎকারকরে সে বলে উঠলো—মাথা নীচু করে বসে পড়—বসে

পড় সুরেশ। সাঁ করে একটা শব্দ হোল এবং ঝক্‌ঝকে কি একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলকে খেলে গেল—ওরা তখন দুজনেই বসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনে দেওয়ালে একটা ভারি জিনিস ঠক্‌ করে লাগবার শব্দ হোল।

সুরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে—একখানা বাঁকা ধারালো চকচকে চীনে-ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়—ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাশুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠলো—ওরই গলা লক্ষ্য করে ছোরাখানা ছোঁড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে অক্রমণ করলে, নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কি দশা হোত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটী থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায়নি—হয়তো বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে! সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে তুলে বল্লে—সুরেশ্বর, এই বেলা উঠে বাড়ীটা খুঁজি এস—এখুনি সব চলে আসতে পারে। একটা ঘর বন্ধ ছিল—বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা—সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগলো।

—মিনি—মিনি—এ্যালিস্—এ্যালিস্—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিমল বল্লে—কি ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দুজনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতেও দরজার কিছুই হোল না। বেজায়

মজবুত সেগুণ কাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখ পড়লো ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা এক মহা সমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উঁচু করে, বিমল তার ওপর অতি কষ্টে উঠলো। সার্কাসের খেলোয়াড না হোলে ও ভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমত দাঁড করিয়ে রাখা অতীব কঠিন ব্যাপার।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল—বিমল সন্তর্পনে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নীচে থেকে সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করলে—কি দেখছ? কেউ আছে?

—ঘোর অন্ধকার—কিছু তো চোখে পডছে না।

—ওদের পরণে নার্সের শাদা পোষাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে—ভাল করে দেখ—

বিমল ভাল করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বল্লে—উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছিনে—শাদা তো কিছুই নেই—সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই—

—উপায়?

—দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, কিন্তু তার আগে দরজা ভেঙ্গে ফেলতেই হবে যে করেই হোক্।

নীচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বল্লে—সুরেশ্বর, মিনি বা এ্যালিসকে এ ভাবে হারিয়ে আমরা কন্‌শেসনে ফিরে যেতে পারবো না। দরকার হোলে এজন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ—খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়ীতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ

আমরা পাইনি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা না দেখে, আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবো না। তুমি এক কাজ কর। আমি এখানে থাকি—তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিশকে খবর দাও। তাদের বলো কন্‌শেসনে টেলিফোন করতে। দরকার হোলে কন্‌শেসনের পুলিশ আসুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে—নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরী করো না, চট্‌ করে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বল্লে—তোমাকে একা ফেলে যাবো? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস্‌ তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়ীটাতে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস নেই! গুণ্ডারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মনে হোল, কন্‌শেসনের ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড বলেছিলেন—চীনা-সাংহাইতে মধ্য এসিয়ার বর্ব্বরতার সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলেছে। এখানে কন্‌শেসনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ দুর্দ্দিনের সময়ে দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই—প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই নিজের পুলিশ। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

কি ভুলই করেছে অত রাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিক্‌সা-ওয়ালার গাড়ীতে চড়ে সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো।

এখন উপায় কি? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কন্‌শেসনে, সে আর স্থরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্তব্ধ নির্জ্জন বাড়ীটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটা চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। আধ আলো অন্ধকারে বিকট মূর্ত্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতির মত দেখাচ্ছে—সেই একমাত্র আলো সারা বাড়ীটাতে। বাকীটা অন্ধকার। আশ্চর্য্য, কোথায় কলকাতার শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাইএর এক নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীর আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস্ চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হোলে সে নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী। হাসপাতাল থেকে বার হয়েই কন্‌শেসনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। স্থরেশ্বরের দেখা নেই। সে কি কন্‌শেসনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটলো। রাত্রির আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কি কাণ্ড।

মিনিট পাঁচ ছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কি বললে—কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বল্লে। ঠিক যেন কাউকে কে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডাটা ফিরে এল না কি!

হঠাৎ দুজন চীনা ইউনিফর্ম্ম পরা পুলিশম্যান বাড়ীর মধ্যে খনিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির স্থরে কি কথা চেঁচিয়ে বলে উঠলো।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের আনীত পুলিশম্যান বাড়ী খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিশম্যান্ দুজন একটু আশ্চর্য্য হোল। তারপর পিজিন ইংলিসে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে চেঁচিয়ে বল্লে— আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি? আলো জ্বেলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বল্লে—আলো জ্বেলে রেখেছি কেন?

—হ্যাঁ, আলো জ্বালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো, লণ্ঠন—যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো—

—আমি তো জ্বেলে রাখিনি? এ আমার বাড়ী নয়।

চীনা পুলিশম্যান দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। এ বাড়ীর যে এ লোক নয়, তারা সে কথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বল্লে—দাঁড়াও, তোমরা যেও না! প্রথমে বলো আলো নিবিয়ে দেবো কেন?

—মিষ্টার, সাংহাই পুলিশ-মার্শালের নোটিশ দেখোনি? রাত এগার-টার পরে সহরের সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক-আউট। বোমা ফেলছে জাপানীরা। তোমার কি বাড়ী?

—আমার এ বাড়ী নয়। সব বলছি, আমি কন্‌শেসনের লোক—যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই সবে রিকসা করে যাচ্ছিলুম—সঙ্গে ছিলেন দুটি মার্কিণ মহিলা। রিকসাওয়ালা তাঁদের নিয়ে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিকসা অন্যপথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়ীটার সামনে রিকসাটা মেয়েদের নিয়ে'

দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়ীতে ঢুকে দেখি, এটা মা জং জুয়াড়ীদের ও চণ্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে! আমার বন্ধু পুলিশ ডাকতে গিয়েছে। তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে, এই তালা বন্ধ ঘরটা খোলো—আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দুটীকে আটকে রেখেছে।

পুলিশম্যান দুজন আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরের চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হোল না। যেন ওরা কখনো ওদের ক্ষুদ্র পুলিশ জীবনে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারের সম্মুখীন হয়নি—ভাবখানা এই রকম।

একজন পুলিশ চৌকীদার এগিয়ে গিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

—না, সাড়া শব্দ দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে।

পুলিশম্যান দুইটীর মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মত অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না, আমার তা মনে হয় না মিষ্টার। তুমি জানোনা এই-সব জুয়াড়ী ও চণ্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ ঘরে ওদের রাখেনি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

—একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মালা ছিল—দুজনের হাতে দুটো সোনার হাত ঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা—

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে, সঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়ীতে ঢুকলো আগে আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ, সঙ্গে একজন ইউরোপীয় কন্‌শেসন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বল্লে—টেলিফোন্ করে দিয়েছি কন্‌শেসনে—পুলিশ মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কন্‌শেসনের পুলিশম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহা মুস্কিল, সহরে ব্ল্যাক আউট, আলো জ্বালবার যো নেই—সব ঘুটঘুটে অন্ধকার।

—ভাঙো দরজা সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পেছনে হু'টা পুলিশ টর্চ্চ জ্বেলে ঢুকলো। তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিশ উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্য্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো এরোপ্লেনের ঘর্ ঘর্ আওয়াজ শোনা গেল। দুজন পুলিশম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বল্লে—আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানী বম্বার—

সুরেশ্বর বল্লে—আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধ্যে বেলা জাপানীরা বোমা ফেল্লে, তখন 'ব্ল্যাক আউট' করলে না—আর এখন এদের হুঁস হোল—

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বল্লে—হাঁ, জাপানী কাওয়াসাকি বম্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কন্‌শেসনে--মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই সহর অন্ধকার। সেই আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে—কারণ নক্ষত্রের আলো সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের আদেশ মানেনি—জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলো কোন্‌দিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপর আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানী বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বল্লে—ব্ল্যাক আউটের জন্য নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো শব্দ আছে?

দুজন চীনা পুলিশ বল্লে—তোমরা বোঝনি মিষ্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেল্লে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানালা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়—পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক'দিন থেকে—

একটু পরে কনশেসনের পুলিশ এলো, চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের ভিড়ে চণ্ডুর ও জুয়াড়ীদের আড্ডার ছোট্ট উঠানটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—সহর ব্ল্যাক আউট। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিধারে—এক্ষুণি জাপানীরা হাইএক্সপ্লোসিভ্ বম্ব্ ফেলবে, তারপরে ফসপেন্ গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে। এ অবস্থায় কি করা যায়? মেয়ে দুটিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কি করে খুঁজি?

কন্‌শেসন পুলিশের কর্ম্মচারীরা বল্লেন—আপনার এলাকায় যত বদমাইসের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

—কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে। দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান

ঠিক করে নিতে যা দেরী! আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়। মেয়ে দুটিকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং তাদের প্রাণের ভয় বর্ত্তমানে নেই একথা ঠিকই। সাংহাইতে এ রকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চাপেই পল্লীতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন। যত গুণ্ডা আর বদমাইসের আড্ডা এই পাড়ায়।

পুলিশের লিষ্ট দেখে কাছাকাছি দুটী বদমাইসদের আড্ডায় হানা দেওয়া হোল—কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিললো না।

তারপর—রাত তখন দেড়টা—এমন এক বিভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, 'এর আগে যে সব বোমা ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে—এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হোল, আকাশ থেকে চারি ধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে সুরু হয়েছে—অসংখ্য। অনেক, অনেক —গুণে শেষ করা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে বিষম বিস্ফোরণের আওয়াজ, ইট টালি ছোটার শব্দ, দেওয়াল পড়ার, ছাদ পড়ার শব্দ, মানুষের কলরব, হৈ-চৈ, কান্না, পুলিশের হুইস্‌ল, মাথার ওপর ঘর্ঘর শব্দ—সবশুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যেরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাহিরে বেরিয়ে এসেছে!

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কনষ্টেবল্ একত্র হয়ে গেল। কন্‌শেসন পুলিশের কর্ম্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাস-পাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ্চ জ্বেলে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগলো।

কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ীর ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে লাগলো। একটা চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। ছুটী ছোট বাড়ী চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা
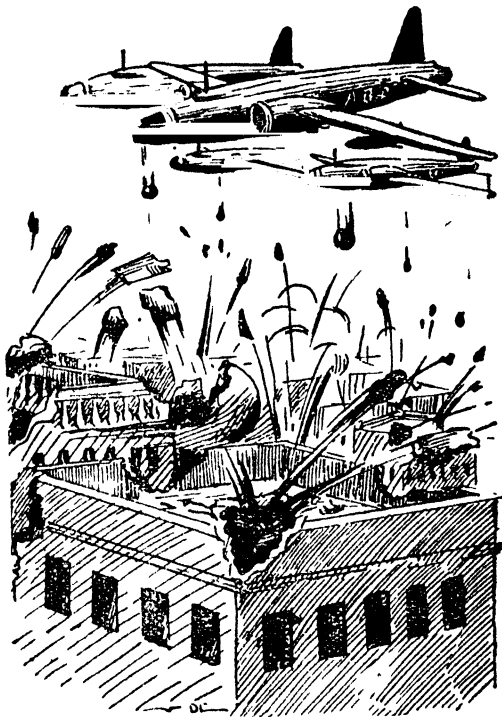
আকাশ থেকে চারিধারে যেন ইন্দ্রের বজ্র পড়ছে

আটকেছে যে, মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখেনি। ইটের স্তূপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হোল—তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হোল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো—সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত্ত, সাবধান!

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উড়ছে—এবং গর্ত্তের ধারে এখনও ছট্‌কানো ধাতুর খোল-ভাঙ্গা টুক্‌রা পড়ে আছে, বিমল টুক্‌রোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে—গরম আগুন!

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়! ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্ত্তটার দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খানা জাপানী প্লেন সারবন্দী হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসছে—ওদের মাথার উপর। বোধ হয় ওদের টর্চ্চের আলো দেখেই আসছে। চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বল্লেন—সাবধান—! বোমার গর্ত্তে লাফ দাও!

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্ত্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চাপেই পল্লী অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপ্ ঝাপ্! দু সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই—সবাই গর্ত্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমলও ওদের সঙ্গে লাফ দিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে ওর হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁকে পুঁতে গেল, গর্ত্তটার মধ্যে কাদা আর জল—কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো—সবাই কোনো রকমে জল-কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেসে—কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্র খচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়—তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিশম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ অবস্থায় কোন এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা

নয়—সে নাকি মাঞ্চুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে বোমার গর্ত্তই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বল্লে—কেন, যদি মেসিন গান চালায়?

আগের লোকটা বল্লে—পুঃ!—মেসিন গান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ'খানা প্লেন্ ঠিক ওদের গর্ত্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নীচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বল্লে—আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে—বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিশম্যানটা বলতে লাগলো—কোনো ভয় নেই—ওরা, মেশিনগান ছুড়ে কিছু করতে পারবে না—কাওয়াসাকি বম্বারের মেসিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়—হোত যদি জার্ম্মাণ হেঙ্কেল্ ফিফটিওয়ান্, কি স্কুল্জ্-ব্যাঙ্ক একশো এগারো—

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে এক সঙ্গে বলে উঠলো—আঃ—চুপ! সঙ্গে সঙ্গে প্লেন্‌গুলো অনেক খানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চ্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত্ত এবং চারি-পাশের আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো—উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পটকা বাজির মত মেসিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদেব কানে তালা ধরবার উপক্রম হোলো।

একজন ফিস্ ফিস্ করে বল্লে—বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মত পড়ে থাকো—ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছো—

আগের সেই মার্কিন পুলিশম্যানটী যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠলো—কিছু হবে না দেখো—হাঁ হোত যদি হেঙ্কেল্ ফিফটিওয়ান—কিংবা—

—আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্ত্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার সেই. অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই—শুধু সে আছে, আর আছে—এই দুর্দ্ধর্ষ, বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্ত্তমান। যে কোনো মুহূর্ত্তে মেসিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্ত্তে—যে কোনো মুহূর্ত্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুঁজে ও পড়ে রইল—ওর পাশে সবাই সেই ভাবেই পড়ে আছে—বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই—খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মত ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা—এর নাম বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিকের দল হোলেও এর বেশী কিছু করতে পারতো না—এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হোত—অন্য গত্যন্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কাণের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনও পায়নি, এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কাণে একেবারে তালা ধরালো যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলো গর্ত্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ—আওয়াজ—এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেসিনগানের আওয়াজ! কিন্তু আওয়াজ যত হোলো কাজ ততো হলো না। মেসিনগানের একটা গুলিও বোমার গর্ত্তের মধ্যে পড়লো না। দুতিনবার প্লেনগুলো গর্ত্তের দিকে নেমে এলো পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না; আওয়াজ কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্ত্তের ওপর থেকে,

হয়তো দেখে ভাবলে গর্ত্তের লোকগুলো সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেসিনগানের দামী গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কি অদ্ভুত কাদা মাথা চেহারা হয়েছে সবাকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত্ত থেকে ঠেলে উঠেই বল্লে—বলিনি তোমাদের, এরা মেসিনগান ছুঁড়ে সুবিধে করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুল্‌জ ব্যাঙ্কস্‌ একশো এগার যদি হোত, তবে চেখতে একটা প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। বোমারু প্লেনগুলো আকাশের অন্যদিকে চলে গিয়েছে। কি ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়লো, এ্যালিস্‌ তার নরম সাদা হাত দুটী তুলে কান ঢেকে বল্‌তো—হোয়াট্‌ এন্‌ অ-ফুল্‌ র‍্যাকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথাটা মনে পড়তেই বিমলের বুকেব মধ্যে কেমন করে উঠলো।

এ্যালিস্‌—মিনি—বেচারী এ্যালিস্‌!—কি ভীষণ কাল রাত্রি আজ ওদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এই দুর্য্যোগেব রাত্রির কথা বিমল কি কখনো ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুবে ডাক্তাবী করবে বলে বাড়ী থেকে রওনা হোল—অদৃষ্ট তাকে কোথায় কি অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে!

হঠাৎ পিনাংএর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি চীনা রণদেবতার ভ্রূকুটী কুটীল মুখ মনে পড়লো ওর।—রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন—

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে—ভীষণ আওয়াজ হোল—অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিশ

ম্যানটী বল্লে—পঞ্চাশ পাউণ্ডের বোমা! দেখেছ কি কাণ্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বল্লে—ওই দেখ, আর একদল বম্বার দেখা দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে—

অন্ততঃ বারো খানা সারবন্দী হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলো-মেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল—এদের ধ্বংসের লীলার মধ্যে একটা প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত সহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লী চাপেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওরা যেন কতকগুলো কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে—কোন অংশ পরিত্রাণ না পায়!

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা নালার মধ্যে অনেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না—মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমূর্ত্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মত কতকগুলো বোমা পড়লো দূরের একটা পাড়ায়—সাংহাইয়ের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা, পুলিশ ম্যানগুলো বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চ্চলাইট জ্বালায়নি, অন্ধকারেই আসছে। কাজেই একটা পল্লীতে ওরা ছটা বড় বোমা ফেল্লে, আন্দাজ এক একটা পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটলো। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য! রাস্তায় লোকে লোকারণ্য ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে

দাঁড়িয়েছে। বাড়ীঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিট্‌কে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে—তারি মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছুদূরে একটী সুন্দরী বালিকার দেহ দুই টুক্‌রো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভুঁড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধূলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এই সব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোট মেয়ে ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চোখ বুঁজে ছুটে একটা ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল—পুলি-শের লোক ওকে ধরে ফেল্লে। মেয়েটির বয়স ন' বছর—সে ভয়ে এমনি দিশাহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ সে কথা বলতেই পারলে না।

ওর হাতেএকটা পু টুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শূওরের মাংসের টুক্‌রো আর গোটাকতক কিস্‌মিস। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়ীতে বোমা পড়বার পরে বাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে—তার বিশ্বাস চোখ বুঁজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হোল।

খুকী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওই তার মা। পাশের বালিকাটী তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে নাম ধাম, বাপের নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিক মত দিতে পারবে না। মেয়েটী পুলিশের জিম্মাতেই রইল—কারণ শোনা গেল ওর বাবা বছর তিন মারা গিয়াছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়ীগুলো থেকে জিনিষপত্র

মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ্চ জ্বেলে টর্চ্চের মুখ নীচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলো টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—

অন্ধকারের মধ্যে বৃদ্ধ ওকে চিনলেন। বল্লেন—আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে বেরিয়েছি দেখি যদি কিছু কাজ করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায়?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। বল্লে—সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রফেসর লি হাসিমুখে বল্লেন—যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম জানেন তো? এরচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাবো সে আলোচনার? হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল—কভার! কভার!

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ীর ইটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া! সবাই সেই দিকে ছুটলো। বিমলও চীনা খুকীটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সেই দিকে।

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়লো কতকগুলো চকচকে রূপোর বাতিদানের মত লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রূপোর নলের মত জিনিষ হাত খানেক লম্বা। ঝক্ ঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে

নিয়ে বল্লে—ইন্‌সেন ডিয়ারি বম্ব—আগুন লাগাবার বোমা—এলুমিনিয়ম আর ইলেকট্রনের খোল, ভেতরে এলুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রণ অক্সাইড ভর্ত্তি। এই দেখ ছ'টা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিকে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবানো যায় না।

জাপানীদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন ওরা সহরে ইন্‌সেনডিয়ারী বম্ব্ ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে. আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন !

কি ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন! বিমল সেই ঝক্‌ঝকে পালিশ করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠলো। এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই সহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবেন তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বল্লে—পঁয়ষট্টি গ্র্যাম এলুমিনিয়ম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্র্যাম আয়রণ অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উড়ো-জাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভালো বোমা তৈরী হচ্ছে—আয়রণ অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু তিনটা রূপোর বাতিদান পড়লো।

দিনের আলোয় ওরা পরস্পরের ধূলো কাদা মাখা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত. চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন তিনি ও তাঁর ছাত্রেরা। পুলিশও এসেছে, দুটো রেড্ ক্রসের হাসপাতাল গাড়ীও এসেছে। আকাশে

জাপানী বোমারু প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত। বেলা এখন দশটা —এখনও সে দুঃস্বপ্নের জের মেটেনি। বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংস-লীলার তাণ্ডব যে চলতে পারে—তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনো ভেবেছিল?

কন্‌সেশনের সেই সবজান্তা আমেরিকান্ পুলিশটা বলছিল—দেখবেন ওরা ইন্‌সেন্‌ডিয়ারি বোমা ফেলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়ীই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় এক রকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালিবোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পার্ক ছোটেনা—কিন্তু সে সব করে কে?

চীনা পুলিসের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—কিন্তু সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের বোমা ফেলার দরুণ চাপেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন এভিনিউতে সাত আটশো বাড়ীর চিহ্ন নেই—মানুষ মারা পড়েছে তিনশোর ওপর মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো। তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বল্লেন—আমাদের সব চেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলো, তা ক'দিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখনো ওরা সমবেত ভাবে আক্রমণ করেনি—করলে একশো খানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু টন বোমা ফেললে পাঁচহাজার লোক কালই মেরে ফেলতো।

সবজান্তা পুলিশম্যানটী বল্লে—জাপানী বম্বারগুলো এক একখানা দু টন

বোমা বইতে পারে না মশায়—সে পারে জার্ম্মাণ ডর্ণিয়ের কিংবা ইটালির কাপ্রোণি—কিংবা—

ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—আহা হা ও সব এখন থাক্—ও তর্কে কি লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে দুটি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুণ্ডারা নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কি উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্ততঃ আর পড়বে না—

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জ্জেণ্ট্ মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে কন্‌শেসন অঞ্চলে চীনা পলাতক নরনারীদের সঙ্গে কন্‌শেসন পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াংসিকিয়াং এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কন্‌শেসন পুলিশ ব্রিজের ও মুখে মেসিনগান বসিয়েছে—তারা বলছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কন্‌শেসনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বল্লেন—কত লোক পালাচ্ছিল?

—তা বোধ হয় দশ হাজারের কম নয়। অর্দ্ধেক সাংহাই ভেঙ্গে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কন্‌শেসনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের। রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড। কন্‌শেসনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বল্লে—আজই মেয়ে দুটীর ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে—দেরি হোলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয় তো?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন—সে বিষয়ে উঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন না। আমাদের বদমাইসদের লিষ্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না—বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী।

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কন্‌শেসনে যাবার জন্যে দুবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হোল না। সে পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেসিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কি করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট পুঁটুলি নিয়ে সহর ছেড়ে পালাচ্ছে—সাংহাই থেকে হোনান্ যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দ্দি গর্ম্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দুখানা হাসপাতালের গাড়ী ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ী দুখানা সহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ীর চার্জ্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্ম্মী হিসেবে।

শীঘ্রই কিন্তু কি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দুজনেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানী প্লেন্ যদি বোমা ফেলে তবে যে কি কাণ্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্ম্মচারী মোটর-বাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর সামনে নামলো। বল্লে—আপনারা এখান থেকে সরে যান—

বিমল বল্লে—কেন?

—জাপানী সৈন্য সহরের বড় পাঁচীল ডিনামাইট্ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে—এখনো দুটো পাঁচীল বাকী—কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে

সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন্ একঘণ্টার মধ্যে সহরের ওপর আবার বোমা ফেলবে।

—এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কি হবে?

—চীনের মহাদুর্ভাগ্য, স্যর। আপনারা বিদেশী, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। আপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটী গাছের তলায় একটী বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুটুলি, গোটা কতক মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্ম্মচারীটি কাছে গিয়ে বললে—কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটীর দিকে চাইলো কিন্তু চুপ করে রইলো। উত্তর দিলে না। সে আবার জিজ্ঞেস্ করলে—কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে?

এবারও বুড়ী কিছু বল্লে না।

বিমল বল্লে—বোধ হয় কাণে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে। চেঁচিয়ে বল।

তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সী। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বল্লে—ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কোথায় আর যাবো? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

—এখানে বসে থেকো না। বোমা পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে কেউ নেই?

বোমার কথা শুনেই বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হোল, ওপরের দিকে চাইলে। বল্লে—আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দাও।

বিমল বল্লে—আমি ওকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে!

দুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটী গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ বত্রিশ, সাত আটটী ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটী দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, বাকী সব দুই, চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটীও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস্ করে জানা গেল বাড়ীর কর্ত্তা জাহাজে কাজ করেন—জাহাজ আজ কুড়ি দিন হোল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ! কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ী থেকে—কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হোল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল গাড়ীতে জায়গা দেবে?

সেদিন সহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে। মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই হোল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাট্‌লো।

রাত্রি শেষে জাপানী নৌসেনা সাংহাই সহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ও সুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানুতো না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণ করলে। বোমারু প্লেনগুলোর তেমন আর দেখা নেই, কারণ সহর প্রায় জনশূন্য। পথে ঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেই চলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য

ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হোল ; তাবপবই ওব মনে হোল এবা চীনা নয়, জাপানী সৈন্য। ক্রমে পিল্‌পিল্ কবে বিশ ত্রিশজন জাপানী সৈন্য হাসপাতালেব বড হলটাব মধ্যে ঢুকলো। চাবিদিকে সোবগোল শোনা গেল। বোগীর দল অধিকাংশই বোমায় আহত নাগবিক, তাবা ভয়ে কাঠ হযে রইল জাপানী সৈন্য দেখে।

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালেব বড ডাক্তাব খানিকটা আগে চলে গিয়েছেন। ওই এখন কর্ত্তা দুজন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওযার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলেব পেছনে দাঁডালো।

হঠাৎ একজন জাপানী সৈন্য বন্দুক তুলে জমিব সঙ্গে সমান্তবাল ভাবে ধবলে—বাইফেলেব আগাব ধাবালো বেযনেট্ ঝক্‌ঝক্ কবে উঠলো। চক্ষেব নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি কবলে তাতে মনে হোল বিমলদেব দেশে সি টকি জালে মাছ ধববাব সময জালেব গোডাব দিকেব বাঁশটা যেমন কাদাজলেব মধ্যে ঠেলে দেয—তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্ত্তনাদ শোনা গেল। পাশেব বিছানায় একটা চীনা যুবক বোগী শুযে ভযে ভযে ওদেব দিকে চেযেছিল—বেওনেট্ তাব তলপেটটা গিঁথে ফেলেছে। চাবিদিকে বোগীবা আতঙ্কে চীৎকাব কবে উঠলো। বক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বিমলেব মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংবাজিতে বল্লে—তোমবা কি মানুষ না পশু?

জাপানী সৈন্যেবা ওব কথা বুঝতে পাবলে না—কিন্তু ওব দাঁডাবাব ভঙ্গি ও গলার সুব শুনে অনুমান কবলে মানে যাই হোক্, প্রীতি ও বন্ধুত্বেব কথা তা নয়।

অমনি সব ক'জন সৈন্য ওকে ঘিবে দাঁডিযে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে—ও-ও বেশ বুঝলে এই যেশ।

সেই দুজন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালবাসতো।

এমনসময় বিমলের কাণে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্র, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ স্বর। জাপানী ভাষায় হোলেও তার অর্থ যেন কোন অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী, লেফটেনান্টের ইউনিফর্ম্ম পরা। সৈন্যেরা ততক্ষণ বেওনেট নামিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানী অফিসারটী এগিয়ে এসে জাপানী ভাষাতেই কি প্রশ্ন করলে। তিন চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে কি বল্লে।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরিজিতে বল্লে—তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বল্লে—তোমার সৈন্যরা কি করেছে তা আগে দেখ। এটা রেড্‌ক্রস হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যেরা আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে।

জাপানী অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবতঃ ভর্ৎসনার স্বরে সৈন্যদের ক বিল্লে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কোন দেশের লোক?

—ভারতীয়।

—রেড্‌ক্রসের ডাক্তার?

—না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

—ও, চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে ?

—হাঁ।

—আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস কর ?

—আমার সামনে আমার রোগীকে খুন করলে ওরা, তার প্রতিবাদমাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানী অফিসারটী ঠাস্ করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের সুর গেল ওর কানে—রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব ক'জন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেল্লে চক্ষের নিমেষে। দুজন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলে চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তারপরে ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চললো রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনা নার্স দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হোল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের মত। একদিকে একটা নীচু বাড়ি।

মাঠের একপাশে একটা ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানী সৈন্যের ভিড। কিছুদূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারী রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানী সৈন্য মাঠটার মধ্যে এদিক ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছে।

এ জায়গাটাতে কি হচ্ছে বিমল বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছুদূরে দাঁড় করালে সৈন্যেরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দুজন চীনাকে জাপানী সৈন্যেরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানী অফিসারটী কি জিজ্ঞেস্

করছে সৈন্যদের। চীনা দুটী সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক, বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানী অফিসারটী কি একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীনাদুটীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বল্লে।

জাপানী সৈন্যেরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে বাড়ীটা তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দুটীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে—তারা কলের পুতুলের মত জাপানীদের সঙ্গে চললো বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারেনি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারেনি, সে বুঝলে—যখন দশজন জাপানী সৈন্যের সারি এক যোগে রাইফেল তুল্লে।

একটা তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হোল, সঙ্গে সঙ্গে দশটী রাইফেলের একযোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুঁজলে।

যখন সে চোখ চাইলে, তখন প্রথমই যে কথা তার মনে উঠলো স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্ব্বপ্রথম মনে হোল—জাপানী রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশী হয় না! কেন একথা তার মনে হলো এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে—জীবনের এই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, কে তা বলবে?

তারপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দুটী উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজন জাপানী সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে দেখে বিমলের মনে হোল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

সঙ্গে সঙ্গে দশটা রাইফেলের একযোগে আওয়াজ

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানী সৈন্যেরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্ব্বের মতো কথা কাটাকাটি হোল জাপানী অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্ব্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। এ চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়লো দেয়ালের সামনে আগের দুজনের মত।

চীনা ভাষা যদিও বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল জাপানীভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কি অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানীরাই কথাবার্ত্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল—এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরুবে। মা বাবার সঙ্গে আর দেখা হোল না, হয়তো তাঁরা জানতেও পারবেন না যে তার কি হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের 'মিসিং'—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!....কিন্তু এ্যালিসের কি হোলো! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিসকে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারী এ্যালিস! বেচারী মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড় দেরী হতে লাগলো।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগলো। তারপর তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলেছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্তূপাকার হয়ে উঠছে।

এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দুজন জাপানী সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে—কিন্তু একটা জিনিষ হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে। মাথাটা যেন হঠাৎ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানী সামরিক অফিসারটী ভাঙা ইংরাজিতে জিজ্ঞেস্ করলে—তুমি রাস্তায় কি করছিলে ?

বিমল ইংরিজিতে বল্লে রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে নিয়ে এনেছে।

—কোন্ হাসপাতাল ?

—চীনা রেড্ক্রস্ হাসপাতাল !

—তুমি সেখানে কি করছিলে ?

—আমি ডাক্তার—। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানী সৈন্যেরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোঁচায়—

পেছন থেকে দুজন জাপানী সৈন্য ওকে রুক্ষ স্বরে কি বল্লে, বিমলের মনে হোল তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানী অফিসারটি বল্লে—থামলে কেন ? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানী অফিসার চারিপাশের জাপানী সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানী ভাষায় কি প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে ?

—না। অত ভাল করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক

ছিল না, তা ছাড়া জাপানী সৈন্যেরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়। দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

—তুমি সিঙ্গাপুরের লোক ?

—আমি ভারতবাসী।

—চীনা হাসপাতালে চাকুরী করো ?

—হ্যাঁ।

—সরাসরি এসেছ চীনে ?

এ প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বল্লে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মত গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে। তারপর যা হয় হবে। সে বল্লে—সরাসরি আসি নি। আন্তর্জ্জাতিক কনশেসনে এসেছিলাম ; ব্রিটিশ কনস্থলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

এই সময় একজন জাপানী সৈন্য কি বল্লে অফিসারটীকে। তার হাতে তিনটে জরিব ব্যাণ্ড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিংবা কম্প্যানি কম্যাণ্ডার।

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করে বল্লে—তুমি একজন গুপ্তচর।

—আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

—আঙ্গুলের টিপসই দাও ছুটো এখানে।

বিমল ছুখানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানী অফিসার কি আদেশ করলে জাপানী ভাষায়, ওকে ছুজন জাপানী সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে

বাইরে একটা কামানের গাড়ীর উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানী সৈন্য গিজ গিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানী ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না? মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করে কামানের গাড়ী টানতে লাগলো একখানা মোটর লরি। ওর দুদিকে সাঁজোয়া গাড়ী চলেছে সারি দিয়ে।

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড সহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে সহরের বাড়ী ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগলো। ফাকা মাঠ আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশের এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নীচু পাহাড় শ্রেণী চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধোঁয়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ী দাঁড়ালো। বিমল দেখলে একটা উঁচু ঢালু মত জায়গায় লম্বা সারি দিয়ে জাপানী সৈন্যেরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুঁড়ছে, এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে, এটা যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীনা নাইন্‌থ রুট আর্মি জাপানীদের বাধা দিচ্ছে—চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানীদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু সরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে

গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানী সৈন্যের। ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও দুজন মরা কি জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্ত্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠলো। পাশের একজন জাপানী সৈন্যকে বল্লে পিজিন ইংলিসে, আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের দেখবো।

সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই—তারা চীনা নয়, জাপানীও নয়। একটু পরে জাপানী অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোনো সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে দু একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়—কারণ আর্ত্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ী, রাইফেল হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে শুয়ে আছে—ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।—

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানী সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই—যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশী।

কিন্তু ঔষধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমন কি খানিকটা আইডিন পর্য্যন্ত বিমল অনেককে বলেও

জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে—সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই।

জাপানী সৈন্যেরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কি, বিমল কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়ীতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানীরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভাল ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানী সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার—এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল—প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে—এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড় দস্তার টব পড়ে আছে—আর কিছু ব্যাণ্ডেজের তুলো। হাসপাতাল শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল—হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধহয় জাপানীদের, তার শরীরে দুই জায়গায় বিঁধেছে—রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। এ কে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানী সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চললো। লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে—সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানী অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানী ভাষায় কি বলাবলি হোল, বিমল

বুঝলে না—হঠাৎ অফিসারটী রিভলভার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলভারছোঁড়ার সঙ্গে স ঙ্গ নেতিয়ে পড়লো। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠলো—চোখের সামনে এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম—যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁদিক ঘেঁসে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে জাপানী অফিসারটী ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই সেদিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাচ্ছে—বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টা বর্ত্তমানে চীনা নাইন্‌থ্‌ রুট্‌ আর্ম্মির দ্বিতীয় ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্ব্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়—তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানী সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ী নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিস জানা জাপানী সৈন্যকে জিজ্ঞেস্‌ করলে—ওখানে কি হচ্ছে? সৈন্যটী বল্লে—শোনোনি তুমি? সাংহাই সহর এখন আমাদের হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

—অত বড় সাংহাই সহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে।

—সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড্‌ টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

—যুদ্ধ হোল কখন?

—কাল সারারাত প্রায় দুশো বম্বার প্লেন বোমা ফেলেছে—শুন্‌ছি বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে—

—সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয়।

—বেশীর ভাগ, হাজার দুই তো শুধু চাপাইতেই মরেছে—আর শুন্‌ছি কম্‌শেসনে বোমা ফেলে ছ'শো পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে—হবেই তো—আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কি, সারা এসিয়া আমরা দখল করবো—তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি—নাও, এগিয়ে চল।

বিমল ভাবছিল সুরেশ্বর কি বেঁচে আছে? বোধ হয় নয়। চাপেই পল্লীর অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউতে চীনা রেড্ ক্রস্ হাসপাতাল। জাপানী বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাত্রেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবতঃ হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে—রোগী, ডাক্তার, নার্স শুদ্ধ্। ভাগ্যে এ্যালিস্ আর মিনি ওখানে ছিল না!

কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নর-নারীদের মেরেছে, এ কথাটা বিমলের ভাল বিশ্বাস হলো না। আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনে বোমা ফেল্‌তে সাহস করে কখনো? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক কন্‌শেসনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল—সাংহাই অধিকার করার পূর্ব্বে ও পরে জাপানী বম্বার প্লেনগুলো যে কন্‌শেসনের পবিত্রতা মানে নি—এ সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গা থেকে এব পবে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড় বড় ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশী দেরী নাই। পূর্ব্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্ততঃ পাঁচ মাইল তখন আসা হয়েছে। জাপানী সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো—এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে

মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হোতে লাগলো গ্রাম খানার দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল, ভগবান করেন—গ্রামটাতে লোক না থাকে—সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হোল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোন খবর রাখতো না—সাংহাই থেকে অন্ততঃ পনেরো ষোল মাইল দূরে এই গ্রাম খানা। এরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল যে চীনা নাইন্‌থ্‌ রুট্‌ আর্ম্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্‌থ্‌ রুট্‌ আর্ম্মি ঘাঁটী ছেড়ে দিয়েছে—ত ওরা সম্ভবতঃ জানতো না।

জাপানী সৈন্যেরা গ্রাম খানাকে আগে চুপি চুপি গোল করে ঘিরে ফেল্লে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকান পত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানীরা হঠাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত নরনারী ঘুমভেঙ্গে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়ালো—অনেকে ব্যাপারটা কি না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতুহলের দৃষ্টিতে জানালা খুলে চেয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হোল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্ব্বর জাপানী সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকীগুলোকে এক জায়গায় জড় করে দাঁড় করিয়ে রাখলে—চারিধারে বেওনেট্‌-চড়ানো রাইফেল্‌ হাতে জাপানী সৈন্যের দল।

দু তিন খানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোট ছোট

বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগলো, একটা পিচ্ গাছের ডালগুলো অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না—একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না—তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানী সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি পঁচিশ এমনি চললো—বেশীক্ষণ ধরে নয়। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁস হোল—সে তার আশে পাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে কোন জাপানী সৈন্য নেই—লুঠপাঠের লোভে সবাই গ্রামের ঘর দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে।

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে—সেদিকে একখানা কামানের গাড়ী দাঁড়িয়ে। গাড়ীর কাছে সৈন্য নেই। গাড়ীখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটা প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃতা বিধবার এমন পুরোনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু' একটা দেখেছে। ততদূর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের আলোয়। কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হট্‌তে হট্‌তে দশ বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে ছুট্ দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটা অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়ালো।

ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। যদি জাপানীরা তাকে এখন ধরে, তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হোল ডোবাটায় বেশ জল আছে। বিমল ডোবার জলে তাড়াতাড়ি নামলো—তার কেমন মনে হোল জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সব চেয়ে নিরাপদ—ডাঙ্গায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশীদূর যেতে না যেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল—সেটা সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ—বোধ হয় দশ বারো মিনিটের পরেই ভীষণ চীৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হৈ চৈ দুপ্ দাপ্ পালানোর শব্দ, আবার চেঁচামেচি—একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব।

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙ্গায় থাকতো তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেতো।

ব্যাপারটা কি? বিমল দেখলে সেই জাপানী কামানের গাড়ীটা ঘিরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে গহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপরে। হ্যাণ্ড্ গ্রিনেড ফাট্‌বার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠলো। একটা—দুটো—তিনটে। জাপানী কামানের গাড়ীর কাছ থেকে জাপানী সৈন্যেরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীন সৈন্যের একটা দল জাপানীদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানীরা ফিল্ড গানগুলো

একেবারে ছুঁড়তে পারলে না—দুটোর একটাও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে দুটো কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীন সৈন্যের এই দলটা হ্যাণ্ড্ গ্রিনেড্ ছুঁড়ে জাপানীদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যাণ্ড্ গ্রিনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানীরা কামানের গাড়ী ও বন্দীদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানী সৈন্য একটাও নেই। কাদামাখা পোষাকে সতর্কতার সাথে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে উঠলো ডাঙায়।

একজন সৈনিকের চড়া আওয়াজ তার কানে গেল—কে ওখানে ?

বিমল আশ্চর্য্য হোল এ পুরুষের গলা নয়—মেয়ে মানুষের মত সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেক্ট্রিক টর্চ্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন অবাক হোল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষ মানুষ নয়, দুজনেই মেয়ে; বয়সেও বেশী নয়। কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দুজনেই—সৈন্যবিভাগে আঁটা-সাঁটা খাকীর পোষাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক্ কাণ্ড! সকলি মেয়ে সৈনিক! এদের মধ্যে পুরুষ মানুষ নেই একজন। এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যাণ্ড্ গ্রিনেড্ ছুঁড়ছিল এবং এরাই জাপানী ফিল্ড গান দুটো ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়লো চীনা নাইন্থ রুট্ আর্মির সঙ্গে একটি নারী বাহিনী আছে—সে সাংহাই চীনা রেড্ ক্রস হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কম্যাণ্ডাণ্ট কিন্তু মেয়ে নয়—পুরুষ। একটা পাইনকাঠের পুরোনো ভাঙ্গা টেবিলের সামনে সম্ভবতঃ একটা উপুড় করা কলসী বা ওই রকম কোন হাস্যকর জিনিষ পেতে খুব লম্বা গোঁপ-ওয়ালা কম্যাণ্ডাণ্ট বসে ছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হোল সমগ্র নারী বাহিনীর মধ্যে এই লোকটী ইংরাজী জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান্ টানের ইংরাজী বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে—তুমি জাপানীদের লোক ?

—না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

—কোথাকার হাসপাতাল ?

—সাংহাইয়ের রেড্ক্রস্ হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

—তুমি কোন দেশের লোক ?

—ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কাম্যাণ্ডাণ্ট্ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—ও! তা ডোবার জলে কি করছিলে ? বিমল লজ্জিত হোল। এতগুলি মেয়ের সামনে!

বল্লে—লুকিয়েছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তার পর হঠাৎ হ্যাণ্ডগ্রিনেডের আওয়াজ আর চিৎকার শুনলাম, তখনি ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের। কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কি একটা গোলমাল উঠলো। কম্যাণ্ডাণ্টকে ঘিরে যারা ছিল, ওরা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানী সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে ?

বিমল চেয়ে দেখলে জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে—তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কি ? হয়তো কোন জাপানী সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে—নিশ্চয়ই।

কিন্তু দলটী কম্যাণ্ডাণ্টের কাছে এসে পৌঁছে যখন ওদের প্রথামত সামরিক অভিবাদন ক'রে দুজন বন্দীকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করাল কম্যাণ্ডাণ্টের সামনে—বিমল চমকে উঠে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো—এ্যালিস! মিনি! কারণ সামনের শীর্ণকায়া মূর্ত্তিদুটি এ্যালিস ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত পা বাঁধা—মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হোল বিমলের এক মুহূর্ত্তে এই চীনা নারী বাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কি? ওরা ছিলই বা কোথায়?

কম্যাণ্ডাণ্ট্ উত্তেজিত সুরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। ইতি-মধ্যে এ্যালিস্ ও মিনির হাত পা ও মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হোল ব্যাপারটা ক্রমশঃ যা জানা গেল তা হোল এই—

চীনা নারী সৈন্যেরা এদের গ্রামের একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এই অবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল—কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙ্গে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউ-রোপীয় বা আমেরিকান্ মহিলা। কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে একটা

অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো।

হঠাৎ বিমল বলে উঠলো—এ্যালিস! মিনি!

প্রথমে ওর দিকে চমকে উঠে চাইলে এ্যালিস। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না—তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বল্লে—তুমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়েগিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগে, এবং খুব সম্ভবতঃ অনাহারেও বটে। সে বল্লে, তোমার বন্ধু কই?

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা পিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে তবে পূর্ব্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে—ভোর হওয়ার বেশী দেরি নেই।

মিনি ও এ্যালিস্ তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে দেওয়া হয়েছে, কারণ এদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

বিমল বল্লে—এখানে তোমরা কি করে এলে?

এ্যালিস্ বল্লে—এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু বড্ড খুসি হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানীরা আক্রমণ করেছে—এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দী অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে—কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

—কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

—আজ তিন দিন হোল খুব সম্ভব—কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—কে তোমাদের আনে ?

—কয়েকজন চীনা দস্যু।

—সাংহাইয়ের চণ্ডুব আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে ?

এ্যালিস্ বিস্ময়ের সুবে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—তুমি কি করে জানলে ? বিমল হেসে বল্লে—আমি আব সুবেশ্বব সেই চণ্ডুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে। কিন্তু বড বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানী বম্বারগুলো সেই রাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ সুরু কল্লে। মিনি বল্লে আমরা খুব জানি। আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটা গরুর গাড়ীর মধ্যে শুয়ে। একটা বোমা তো আমাদের গাড়ীর পাশেই পডলো।

এ্যালিস্ বল্লে—তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোবাশে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদেব ছাডবে না। দেশের বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল—আমরা দিইনি। আজ ওবা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানী সৈন্যেবা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘবের মধ্যে বেঁধে রেখে পালাবে—আমরা নিঃশব্দে পুডে মরবো। করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে সৈন্যেরা না এলে জাপানীরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বল্লে—কি সর্ব্বনাশ !

এ্যালিস বল্লে—সর্ব্বনাশ আর কি, পুড়ে মরতাম এব আর সর্ব্বনাশ কি ? কতই তো মরছে ! কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে, বিমল ?

—আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানীরা বন্দী করে এনেছিল।

আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারতো যদি একথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনস্যুলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্ট্রি করা আছে।

মিনি বল্লে—সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনস্যুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়—চলো কম্যাণ্ডাণ্ট্‌কে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়ালো। এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগলো, এমন একটা জিনিস নতুন দেখছে সে—বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী—রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দ্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা—মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।

একটী মেয়ে ইংরাজিতে বল্লে—তোমরা হ্যাংচাউতে রাজকুমারী তাংএর দেউল দেখছ?

এ্যালিস্ বল্লে—না, সে কি?

—পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে মুখে আছে। এখান থেকে বেশী দূর নয়—দেখে যেও।

বিমল বল্লে—তুমি বেশ ইংরাজি বলতে পারো তো?

মেয়েটী এমন হাসলে যে তার তের্চ্চা চোখ দুটো বুঁজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মত দেখাতে লাগলো।

—ভাল ইংরিজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরিজি। মিশনরী স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম এসময়ে। ইংরিজি গান পর্য্যন্ত গাইতে পারি—শুনবে? হঠাৎ বিউগল বেজে উঠলো। সবাই ব্যস্ত হয়ে

কম্যাণ্ডাণ্টের তাঁবুর দিকে চললো। এখনি মার্চ্চ সুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানীদের বড় একটা দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁদিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মত লম্বা ঢিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যেন শাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌ফট্‌ শব্দ হচ্ছে—শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু বাগানের পাখী তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটাফট্‌ আওয়াজের মত।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম বিমল জানতো।

সবাই বল্লে—মাথা নীচু করো—মাথা নীচু করো—

জাপানী সৈন্যেরা আক্রমণ করে ওই ঢিবিটাতে আড়াল নিয়েছে—কিন্তু হয়তো এখুনি বেওনেট্‌ চার্জ্জ করবে কিংবা হ্যাণ্ডগ্রিনেড্‌ নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমিষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ ঢিবিটার দিকে ফেরালে। একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চীৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল—তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে—সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল বন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস উঠে ছুটে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে—আশপাশের মেয়েরা বল্লে—মাথা নীচু—মাথা নীচু—শুয়ে পড়ো—

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে—তারপর সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসলো। আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ী দেখে বল্লে—এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ এই ত্থাখো গলায় লেগেছে গুলি—তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল।

এ্যালিসকে এক রকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দ্দান্ত জাপানী গ্রিনেডিয়ারেরা হ্যাণ্ডগ্রিনেড্ নিয়ে ছুটে আসে ঢিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটাও টিক্‌বে না। জাপানী হ্যাণ্ডগ্রিনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কম্যাণ্ড্যাণ্ট কি ভরসায় এদের এখনো শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলোই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্য ওরা বাঁচাতে হয় বাঁচাক, না হয় যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হোল!

ফটাফট্—

আবার একটা অস্ফুট চীৎকার! তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চীৎকার না করেও সারির মাঝামাঝি দুটী মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজরে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটী মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটী রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটী মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। আঃ—কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড। পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়—কিন্তু এই ধরণের নারী-বলির দৃশ্যটা বিমলের অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠলো!

বিমল বল্লে—এ্যালিস। কম্যাণ্ড্যাণ্ট্‌টি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? হঠে যাবার অর্ডার না দেওয়ার মানে কি? জাপানীরা বেওনেট্ কি হ্যাণ্ডগ্রিনেড্ চার্জ্জ করলে একজনও বাঁচবে।

এ্যালিস বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে—তার ওদিকে মিনি।

মিনি বল্লে—কম্যাণ্ড্যাণ্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন মানে আছে। মানে কি আছে তা জানবার আগেই আরও দুটী মেয়ে মুখ

চক্ষের নিমিষে সবাই উপুড় হযে শুয়ে—

গুঁজরে পড়ে গেল—এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্ম্মস্পর্শী বলে মনে হোলো। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর পেয়ারাব আকাবেব বস্তু শায়িতা মেয়েদেব সারিব অদূরে এসে পড়লো—বিমল ও এ্যালিস্ দুজনে ই বলে উঠলো—গ্রিনেড্!

কিন্তু হ্যাণ্ড-গ্রিনেড্‌টা ফাট্‌লো না। বোধ হয় এবার জাপানীরা চার্জ্জ করবে। এ্যালিস্‌ ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় কম্যাণ্ড্যাণ্ট ওদের হঠবার অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়েই পিছুদিকে হঠতে লাগলো। সামনের সারিগুলো ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা চার্জ্জ করলে। দলে দলে ওরা ঢিবিটা পেরিয়ে 'বানজাই' বলে ভীষণ বাজখাই চীৎকার করতে করতে ছুটে এল—এদিকে নারী-বাহিনীর সব বন্দুকগুলো এক সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলো। এখানে ওখানে জাপানী সৈন্য ধুপ-ধাপ করে মুখ থুব্‌ড়ে পড়তে লাগলো! তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সর্ব্ব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত আটটা হ্যাণ্ড্-গ্রিনেড্‌ ছুঁড়লো চার পাঁচটা ফাটলো। আরও কতকগুলো জাপানী সৈন্য মাটীতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানী এদের দলের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হোল—বাকী একজনের মাথায় গুলী লেগে সাবাড় হোল।

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রায় একশো দেড়শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যাণ্ডগ্রিনেড্‌ কোনো কাজে আসবে না—কেবল কার্য্যকরী হতে পারে মিল্‌স্‌ বম্ব্‌ জাতীয় বোমা। সে কোন দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কমাণ্ড্যাণ্ট বিমলকে ডেকে বল্লে—এরকম কেন করেছি, আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন। এর কিছু দূরে মিং-চাউএর রেল ষ্টেশন। দুটো সৈন্যবাহী ট্রেণ পর পর চলে যাবার কথা। জাপানীরা রেল ষ্টেশন আক্রমণ করতো। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে

রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেণ দুটো চলে গিয়েছে। এখন আর আমার সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যক। জাপানীরাও তা বুঝেছে ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই—সেই ট্রেণ দুখানা।

কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

—আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে—তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে বুঝুক্ সে কথা।

মিং-চাউয়ের রেল ষ্টেশনে পৌঁছে সবাই খাওয়া দাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়লো মিনি ও এ্যালিসকে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্ততঃ সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কম্যাণ্ড্যাণ্ট্‌কে বলে কিছু চাল যোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস্ একটা পুরাণো সস্‌প্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিন জনের মত।

বেলা প্রায় বারোটা। রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলে-মেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়ালো। তারা ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সস্‌পানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বল্লে—এরা আশ-পাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছেলেমেয়ে; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে! ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস বল্লে—পুওর লিট্‌ল ডিয়ারস্!....ওদের কি খেতে দি, বিমল?

বিমল মুস্কিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্য নয়—মিনি ও এ্যালিস্ কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ও ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। নিজে না হয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস্ যেমন মেয়ে নিজের মুখের ভাত সব এক্ষুণি তুলে দেবে এখন ওদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হোল! ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে চীনা

খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিক ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু কিছু দিলে। তারা চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছা ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বল্লে—বিমল, বলো না, ওদের মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে যাবে? আমি খুব যত্ন করবো। বিমল হাসলে, তা কি কখনো হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেণ এল। তাতে সব খোলা ট্রাক, কয়লার গাড়ীর মত। কম্যাণ্ডাণ্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়লো। ট্রেণের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানীরা এখান থেকে ব্যইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেণ এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেণ ছাড়লো। গার্ড বল্লে ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেণের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌছে দিতে পারবো কিনা নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশেক দুধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের ক্ষেত, আমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ট্রেণ চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটা পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যটা কেমন করে উঠলো। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেণের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘর্-ঘর্ আওয়াজ। ট্রেণ যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগলো।

মিনি বল্লে—ওই দেখো বিমল এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!—

চক্ষের নিমিষে এরোপ্লেন সারি নিকটবর্ত্তী হোল—কিন্তু ট্রেণখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বড় নীচু হয়ে গেল। ট্রেণের সকলের মুখ

শুকিয়েছিল আগেই—এখন যেন বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেণের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তারও গায়ে ছাদ-খোলা ট্রাক্ গাড়ী বোঝাই সৈন্য, কারও মৃতদেহ এর পর সনাক্ত পর্য্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষে।

এরোপ্লেনখানা নীচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মত একটা বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত ট্রেণখানা কেঁপে নড়ে উঠলো যেন, কিন্তু ট্রেণের বেগ কমলো না। বিমল চেয়ে দেখলে রেলখানি থেকে দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্ত্তের সৃষ্টি করে মাটী, ধূলো, ঘাস, বালি অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ হাত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধেঁায়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধি লাভ করেছে। বোমারু তাগ্ ঠিক করতে পারেনি।

আর মাইল পাঁচ ছয় পরে একটা রেলষ্টেশন। গাড়ীখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই দেখা গেল ষ্টেশন থেকে প্রচুর ধেঁায়া বেরুচ্ছে—লোকজন ছুটোছুটি করছে—একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেণখানা ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখা গেল জাপানী বিমান থেকে বোমা ফেলে ষ্টেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুম্‌ড়ে বেঁকে ছিট্‌কে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে—গোটা প্ল্যাটফর্ম্মে মানুষের ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ, কারো হাত, কারো পা, কারো মুণ্ড।

নিকটে একখানা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইন্‌সেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেণ থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটলো। গ্রামের লোক বেশী মরেনি—তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ

পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। একটা মেয়ে একটা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কি জিজ্ঞেস্ করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একটু পরেই সেখানে ভারী একটা অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়লো।

গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট মাঠ—তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কি বলছেন বক্তৃতার ধরণে। বিমল চিনলে—প্রোফেসর লি!

এ্যালিস্ সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—ড্যাডি! চিনতে পারো?

সৌম্য মূর্ত্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস হেসে বল্লে—এই ট্রেণে নামলাম। আর একটু হোলে আমাদের কাউকে দেখতে পেতে না—আমাদের ট্রেণেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বল্লে—গুড মর্ণিং, প্রোফেসর লি! আপনাদের দলবল কোথায়? আপনি কি করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বল্লে—দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন

বোমা ফেলতে এলে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দেখ গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায় ?

—আপনাকে তো সর্ব্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি ! পরের সাহায্য করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন—আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু অত্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে—আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক'দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্ব্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই বা হবে ?

বিমল বল্লে—বড় ইচ্ছে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন ? বুদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্ত্তিতে !

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস এবং আরও কয়েকটী মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেণ হুইস্‌ল দিলে। কম্যাণ্ড্যাণ্টের হুকুম শোনা গেল—ট্রেণে গিয়ে উঠে পড়।

এ্যালিস বল্লে—ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে ? আমরা দুটী মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটী তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই—অনুমতি দেবে ড্যাডি ?

বৃদ্ধ বল্লেন—এখন তোমরা যাও খুকীরা—শীগগীর আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেণ আবার চললো।

দুধারে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানী বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস্ বল্লে—বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? প্রোফেসর লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভাল লেগেছে ওঁকে। আমার নিজের বাবা নেই ওঁকে দেখে আমার সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড় বড় চোখদুটী অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বল্লে—আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বল্লে—অথচ কি ভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ তা জানো? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি—আজ প্রায় একবছর আগের কথা—তখন হ্যাং-চাউ বেলষ্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন—বল্লেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমার হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস্ বল্লে—তখন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক!

উনি যুদ্ধে উপদ্রুত অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে এসেছিলেন এটা ঠিকই—কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সে সব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth—নয় কি? বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটী নদীর পুল বোমায় ভেঙ্গে দিয়েছে। আর ট্রেণ যাবার উপায় নেই। বেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্ম্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোন রকমে মেরামত করে চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফিল্ড্ হাসপাতাল।

ট্রেণ থেকে মেয়ে সৈন্যদের ক্রমেই নামিয়ে দেওয়া হোল। ট্রেণ খানা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হঠে চলে গেল। কোনো বড় ষ্টেশনে গিয়ে এঞ্জিন খানা সোজা করে জুড়ে নেবে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় জলা অঞ্চলের মত। ফসলের ক্ষেত নেই—সামনে একটা বিল কিংবা ঐ ধরণের জলাশয়—দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মত নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং-চাং। বিমল নেমে চারিদিকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেণে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কি করে এল?

বিমলের ধারণা ছিল জাপানীদের আসল ঘাটি কোন্‌কালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কম্যাণ্ডাণ্ট্ তাকে বুঝিয়ে বল্লেন এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং-কাউ সহর পর্য্যন্ত ওদের সৈন্য রেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূল ভাগে অনেক দূর পর্য্যন্ত ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটীতে একটা নক্সা এঁকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটা অনুচ্চ ঢিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটা গ্রাম—পাশে কাদের অনেকগুলো বড় ছোট তাঁবু—সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না চলছে। পশ্চিম দিকে একটা বড় শস্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কি গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লীদৃশ্য।

এ কি ধরণের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছ'জন আহত সৈন্যকে ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতাল তাঁবুতে আনা হোল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস্ করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশীদূর তাও নয়—ওই গাছের সারির ওপাশেই এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটা ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানীরা দখল করে সেখানে ঘাটি করেছে—চীন সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কম্যাণ্ড্যাণ্টের আদেশে মেয়ে সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগলো—কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বল্লে—খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কম্যাণ্ড্যাণ্ট্ বল্লেন—না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না—ওদের অন্ততঃ দশঘণ্টা বিশ্রাম করতে দেবো।

—তারপর?

—তারপর যুদ্ধেও পাঠাতে পারি—রিজার্ভ রাখিতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যান্‌কাউ-ক্যাণ্টন রেলের ধারে একটা গ্রামে নাইন্‌থ্ রুট্ আর্ম্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তিং আছেন—তাঁর হুকুম মত কাজ হবে।

—হুকুম আসবে কি করে?

—ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেস্‌প্যাচ্ রাইডারের দল। আমাদের ফিল্ড্ টেলিফোন্ নেই।

কম্যাণ্ড্যাণ্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটী হতভাগ্য সৈনিক কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্ব্বেই মারা গেল। বাকী কয়েকজনের

করুণ আর্ত্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠলো। কি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! একথা বিমলের মনে না এসে পারলো না।

এ্যালিস্ এসে বল্লে—এদের জন্যে বৃথা চেষ্টা। এদেব একজনও বাঁচবে না।

বিমল বল্লে—তাই মনে হয়! না আছে ঔষধ, না আছে যন্ত্রপাতি কি দিয়ে চিকিৎসা করবো?

—বিমল, এদের জন্যে আমেরিকান্ রেড্ ক্রসে লিখে কিছু জিনিষ আনার চেষ্টা করবো?

—লেখো না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

—ঠিকই তো? এটা কি একটা হাসপাতাল? কি ছাই আছে এখানে?

—মিনি কোথায় গেল?

—সে রাঁধছে। খেতে হবে তো? বাঁধবারও কোন বন্দোবস্ত নেই। দুটো চাল ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

—টিনবন্দী খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নি। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

—একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও—মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলচে তোমায় বলতে।

—আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্য্যন্ত কোনো ট্রেণ এখান থেকে যাচ্চে না তো? আচ্ছা, কাল কম্যাণ্ড্যাণ্ট্‌কে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিক্‌কে ষ্ট্রেচারে করে আনা হোল। একজনের মাথায় খুলি অর্দ্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বল্লেই হয়। বিমল বল্লে—এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনী শক্তি চীনা সৈনিকটীর। মাথার ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দুবার ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হোল, তবুও সৈনিকটী মারা গেল না—বিমল আজ ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেস্‌প্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বল্লে—আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে—শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেল-লাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা? রেল লাইনটী দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানীরা প্রায় একমাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তারপরে সৈনিকটী একটা ফিল্ড্‌ গ্লাস বা'র করে বিমলের হাতে দিয়ে বল্লে—পূবদিকে ওই যে গাঁ খানা দেখা যাচ্ছে ওদিকে চেয়ে দেখ—বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিক্টী বল্লে—ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ ক'দিন চেষ্টা করছে—ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্দ্ধেকটা দখল করেছে। সুতরাং বোধ হয় কাল কি পরশু রেল লাইনে এসে পৌঁছবে।

—গ্রামে লোকজন আছে?

—পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে—ওর ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট দশখানা গ্রামের লোক জড় হয়েছে ওখানে।

—খাবার দিচ্ছে কে?

—কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দ্দশা দেখলে বুঝবে বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ কি নিষ্ঠুর ব্যাপার।

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেস্‌প্যাচ রাইডার সৈনিকটী শিক্ষিত ভদ্রসন্তান –পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—পূর্ব্বে স্কুল মাষ্টারী করতো, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বল্লে—তুমি আমাকে ওই গ্রামে একবার নিয়ে চলো না?

—এমনিই তো যেতে হবে। বোধ হয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে—কারণ শত্রুর লাইন থেকে জায়গাটা দূরে।

—এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে ?

—কেউ না। সে তো সর্ব্বত্রই ফেলছে। তবে একটা পাইনবনের তলায় এ বস্তি—জাপানী প্লেন্ হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না—পাছে ধোঁয়া দেখে বোমারু প্লেন্ সন্ধান পায়। সৈনিকটী চলে গেলে বিমল এ্যালিস্‌কে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেণের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস্ তাড়াতাড়ি তাঁবুব বাইরে এসে বল্লে—ট্রেণ আসছে, না এরোপ্লেন্? বিমল বল্লে—ট্রেণই। বোধ হয় আরও সৈন্য আসছে। চল দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনেব ধাবে জড় হোল। এখানে ষ্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল—নিশান দেখিয়ে ট্রেণ দাঁড় করাবে। ট্রেণ এসে পড়লো। সারি সারি খোলা মাল গাড়ীতে সৈন্য বোঝাই—অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলো ছাদ-আঁটা মালগাড়ী পেছনের দিকে—তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ী থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগলো। জাপানী সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যাণ্টন থেকে। রসদ বোঝাই মালগাড়ীগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগলো

—কারণ বেশীক্ষণ ট্রেণ দাঁড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানী বিমান আকাশ পথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস্ উত্তেজিত সুরে বল্লে—বিমল বিমল—ও কে? প্রোফেসর লি না?

তারপরই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি—ড্যাডি—সত্যিই তো—হাস্যমুখ বৃদ্ধ একটা বড় কেম্বিসের ব্যাগ হাতে ভিড ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন!

বিমল এগিয়ে গিয়ে বল্লে—নমস্কার প্রোফেসর লি—ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস্ ততক্ষণ গিয়ে তাঁব পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বিমলেব দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীব ওপারে—সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়ব রেডক্রশ দুশো পিপে ভাল কালিফোর্ণিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক বালিকাদের খাওয়াবাব জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য অন্য স্থানে—দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালই হয়েছে—তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস্ তো বেজায় খুসী। বল্লে—ড্যাডি, খুব ভাল কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছ। চলো, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্ত ভাবে বল্লে—শীগগির এসো বিমল শীগগির এসো এ্যালিস্—সুরেশ্বর নামছে ওই দেখ ট্রেণ থেকে—

সুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে—তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে—সাংহাই চীনা রেড ক্রস্ হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বল্লে—প্রোফেসর লি—একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচ মিনিটের জন্যে আসছি। সুরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক। বল্লে—তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিসই বা এখানে কি করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুণ্ডারা গুম্ করেছে—আর বিমল তুমি জাপানীদের হাতে বন্দী। মিনি কেমন আছ?

বিমল বল্লে—সে সব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যাক্। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লি'কে ডেকে আনি—উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চলো ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলো নামাবার কি ব্যবস্থা হোল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নরনারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস ও মিনি আপেল বিলি কাজে প্রফেসর লি'র সাহায্য করছিল। এ জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটা পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরাণো কেম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দ্দশা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হোল। ছোট ছোট উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত্ত, কাদামাটিমাখা, শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল। নাঃ—বড় ছেলেমানুষ এই এ্যালিস্!....এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কি সুন্দর মেয়ে এ্যালিস্ আর কি ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে

করতে প্রফেসর লি হঠাৎ একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নীচু করে দেখে বল্লেন—চারটে আপেল আর বাকি আছে। আমি কালিফোর্ণিয়ার আপেল কখনো খাইনি—একটী আমি খাবো।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মত আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরণের ভালবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হোল, বৃদ্ধের প্রতি। এঁকে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না—অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দুজনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্ব্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলির হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রফেসর লি আর এ্যালিস্ (অবশ্য মিনিও আছে)—এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস্ ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মত।

—ড্যাডি, ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না?····

বৃদ্ধ হাসিমুখে বল্লেন—মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়োবাবা খায়? দুটী রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে—আর একটী বাকী আছে কে নেবে?

বিমল বল্লে—সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বল্লে—বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস্ বল্লে—খাও সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বল্লে—তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেবো।

প্রোফেসার লি মীমাংসা করে দিলেন—একটা আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে, তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

চারটে আপেল আর বাকী আছে—

সেই সৈনিক ডেস্‌প্যাচ রাইডারটি এসে খবর দিলে হাসপাতাল তাঁবু এখানেই উঠে আসছে—পাইনবনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে কম্যাণ্ড্যাণ্ট্ খবর পাঠিয়েছেন। ডেসপ্যাচ রাইডার আরও এক করুণ সংবাদ দিলে—আজ সকালে জাপানীদের হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ চার্জ্জে নারীবাহিনীর সতেরোটী তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ—হাত পা, মুণ্ড, আঙুল ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে।

মিনি শিউরে উঠে বল্লে—ও, হাউ সিম্প্লি ড্রেড্ফুল !

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠলো। এ্যালিসের মতই উদার, নিঃস্বার্থ সতেরোটি তরুণী—কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয় শূন্য করে চলে গেল!—মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয় ?

হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত্ত সোরগোল উঠলো। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে—একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু একজন উর্দ্ধশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেস্প্যাচ রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্লে—নীচু হয়ে বসে পড়ুন—সবাই শুয়ে পড়ুন—জাপানী বম্বার !

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো।…বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইন-বনের মাথার ওপর আকাশে দুখানা কাওয়াসাকি বম্বার….নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

প্রোফেসর লি—প্রোফেসর লি—এদিকে আসুন—

ভীষণ একটা আওয়াজ….বিদ্যুতের মত আলোর চমক…ধোঁয়া, মাটী…….পায়ের তলায় মাটী কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের মত……..

সবারই কানে তালা........চোখে অন্ধকার........জাপানী বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আর্ত্তনাদ কান্না...গোঁঙানি....নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত্ত চীৎকার।

আবার একটা।—বিমলের মনে হোল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত.... পৃথিবী দুলছে, আকাশ দুলছে...কেউ বাঁচবে না, মিনি, এ্যালিস, সে, সুরেশ্বর, প্রফেসাব লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংস হবে।........

তারপর ক'টা বোমা পড়লো এরোপ্লেন থেকে—তা আর গুণে নেওয়া সম্ভব হোল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্য-কণ্ঠের আর্ত্তনাদের একটা একটানা শব্দপ্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল। এরোপ্লেন চলে গিয়েছে—যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল—তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠার মধ্যে ধরা।—মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সকলে মাটীতে শুয়ে—হয়তো সবাই মারা গিয়েছে—সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটী থেকে ঝেড়ে উঠলো এ্যালিস। তারপর প্রফেসার লি, তারপর সুরেশ্বর।—মিনি মূর্চ্ছা গিয়েছে—অনেক কষ্টে তার চৈতন্য সম্পাদন করা হোল। হঠাৎ এ্যালিস চমকে উঠে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখিয়ে প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

সেই তরুণ ডেস্‌প্যাচ রাইডারের দেহ অস্বাভাবিক ভাবে শায়িত কিছু দূরে। রক্তে আশেপাশের মাটী ভেসে গিয়েছে—একখানা হাত উড়ে গিয়েছে—বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। কয়েকটী ছেলেমেয়ে এবং একটী বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইন-বনের পাতার আড়ালে ছিল এরা—ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমত হয়নি।

প্রোফেসর লি'র সঙ্গে এ্যালিস্ ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হোল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেণ এসে দাঁড়াল। নাইনথ্ রুট্ আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন ট্রেনথেকেনামলো—এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দুটো সাঁকো পাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বল্লে—আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করচি, অথচ লড়াই যে কোন্দিকে হচ্ছে—কি ভাবে হচ্ছে—তা কিছুই জানিনে, চোখেও দেখতে পাচ্ছি নে।

রাত্রে কম্যাণ্ডাণ্টের সার্কুলার বেরুলো—রেললাইনের প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে—আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আক্রমণ করবে—সকলে তৈরী থাকো, যারা সৈন্য নয় বা যুদ্ধ করছে না—এমন শ্রেণীর লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি কোট গায়ে বাহির থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বল্লে—আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়েএসেছে। সার্কুলারদেখেছ?

বিমল বল্লে—গতিক সেই রকমই বটে। জাপানীরা হাণ্ডগ্রিনেড্ চার্জ্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

—আমি ভাবছি মেয়েদের কথা....

—প্রফেসর লি'কে কথাটা বলা ভালো। উনি কি বলেন দেখি।

প্রোফেসর লি'কে ডাকতে গিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে

পড়লো। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটা ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস্ ও মিনি কি রান্না করছে আগুনের ওপর— বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুণ ঘেঁসে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মত গল্প করছেন।

এ্যালিস্ বল্লে—তোমার বন্ধু কোথায় বিমল....খেতে হবে না তোমাদের আজ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন। উঃ—কি সত্যি কথা। গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে কিছু যায় নি! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুকনো সিঙ্গাপুরী কাঁচকলা, চর্ব্বিতে ভাজা।

একজন ডেস্‌প্যাচ রাউডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাহিরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট শিল-করা খাম।

—আপনি হাসপাতালের ডাক্তার?

—আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আসছে, টেলিগ্রামে অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যান্‌কাউতে এই ট্রেণে যাবেন; আপনাকে একথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড্ নাইট।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন?

....আমরা এই রেলের জন্যে আর লোক ক্ষয় করবো না। জেনারেল টু-টের আদেশ এসেছে হেড্ কোয়াটার্স থেকে। পরবর্ত্তী যুদ্ধ হবে এর দশ মাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরী হোন। আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। তিনি বল্লেন—আমি এই ট্রেণে গরীব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবো। নইলে

জাপানী বোমা থেকে যাও বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যাণ্ড্গ্রিনেড্ খেলে তাও যাবে। আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কম্যাণ্ড্যাণ্টকে জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন ?

ডেস্প্যাচ রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হোল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেণ। ট্রেণখানা প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়ীগুলো শুঁটকি মাছ বোঝাই—বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেণে উঠলো—মিনি, এ্যালিস্, দুটী চীনা নার্স, সাত আটটী রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু ট্রেণের সামরিক গার্ড কম্যাণ্ড্যাণ্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়ীতে ওঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস্ বল্লে—বিমল, ওদের বলো তাহলে আমরাও যাবো না। ওঁকে ফেলে আমরা যাবো না। ট্রেণের সামরিক গার্ড বল্লে—আমার কোন হাত নাই। আপনারা না যান, পোনের মিনিট পরে আমি গাড়ী ছেড়ে দেবো।

এ্যালিস্ ও মিনি নামলো। বিমল ও সুরেশ্বর নামলো। চীনা নার্স দুটীও এদের দেখাদেখি নামলো। ট্রেণের গার্ড বল্লে—রোগীরা কাদের চার্জ্জে যাবে ? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনার হাসপাতালের কর্ম্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বল্লে—সে এঁরা নন্—এই মেয়ে দুটী। এঁরা আমেরিকান রেড ক্রস সোসাইটীর। চীনা পার্লামেণ্টের হাত নেই এঁদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেসপ্যাচ রাইডারটিকে

প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেণে উঠে পড়লেন, ট্রেণও ছেড়ে দিল।

দিন পনেরো পরে।

হ্যানকাউ সহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন্ তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটী ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ করেন একষট্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এ্যালিস ও বিমল মার্ব্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরে অতি বিখ্যাত লালমাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ দেখতে আসে—আর আসে নব বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিত জীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটা গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস ক্লান্ত ভাবে বসলো।

বিমল বল্লে—মিনিরা কোথায়?

—মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বসো। কেমন সুন্দর লাল-মাছ খেলা করছে দেখো। আমি কি ভাবছি বিমল জানো, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন গাছের সারি—সব জাপানী বোমায় একদিন হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে চুরমার করে বর্ব্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

—এ্যালিস, আর কতদিন চীনে থাকবে?

—যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজনও আহত চীন সৈনিক হাসপাতালে পড়ে থাকে। যতদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে—কিন্তু বিমল ততদিন তোমাকেও তো থাকতে হবে—তোমাকেও যেতে দেবো না।

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি'র প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্ত্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস বল্লে—ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না—এলেন প্রফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকতো, তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিকশাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হত না—এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বল্লেন—হ্যান্‌কাউ সহরে এসে আমার গরীব গ্রামবাসিরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তৈরী মাটীর নীচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস্‌, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাবো।

এ্যালিস বল্লে, কেন?

—দক্ষিণ চীনের সর্ব্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে?

বিমল বল্লে, কিন্তু আপনি একা গিয়ে কি করবেন?

—আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেডক্রস সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে। টাকাটা শীগগির আসবে।

এ্যালিস বল্লে—ড্যাডি আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন ? আমার মাসীমা নিঃসন্তান. বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকাটা আমি চাইলেই পাবো। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি—হ্যান্‌কাউ সহবে দুঃস্থ বালক বালিকাদের জন্য একটা 'হোম' খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গভর্ণমেণ্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবো !

প্রেফেসর লি বল্লেন—তোমার ধন্যবাদ, এ্যালিস। অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমাব টাকা নেবো না। তা ছাড়া, এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারবো না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক বালিকাদের আমরা জায়গা দিতে পারি। সাবা দক্ষিণ চীন বিপন্ন কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি ? মাঝে পড়ে তোমার টাকাগুলো যাবে।

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের উপব প্রফেসর লি'র স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহেব মতই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলো খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি 'হোম' গঠনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোকদের আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেবো না ?

এমন সময় সুরেশ্বর ও মিনি এসে বল্লে—এসো এ্যালিস এসো বিমল, একটা জিনিস দেখে যাও ?

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে ওদের আগে আগে দুটী চীনা তরুণ তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোট ছোট ধ্বজা, মোম বাতি ও ফুল।

মিনি বল্লে—ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরাজি জানে ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটীকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটীও বাগদত্তা। ফা-চিন মন্দিরে আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছে—

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠলো। বর্ত্তমান যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিযে যেতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প—ষোল সতেরো!

চীন দেশে সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোন দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই-করা কাঠের চৌকাঠ পার হয়ে রাজকুমারী ফা-চিন এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি জালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে. দুজনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠলো—ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালো, দুজনে দুজনের হাত ধরে আছে—দুজনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস বল্লে—মিনি, ওঁদের এখানে দাঁড়াতে বলো না? আমাদের অনুরোধ—

মিনি বল্লে—আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান—মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনা-ভাষায় বল্লে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নীচু করলে।

যুবক হাসি মুখে বল্লে—ফটো নেবেন বুঝি ? আলো নেই মোটে—ফটো উঠবে ? এ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লি'কেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বল্লে—ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীর্ব্বাদ করুন—তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনাভাষায় কি কথাবার্ত্তা বল্লেন, তারপর সকলে অর্দ্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো নব দম্পতীকে।

প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটী কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন—তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস ও মিনির কি হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে !

তরুণ তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই—এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চিন্ মন্দির, পাইন বন. লাল মাছের চৌবাচ্চা শান্ত গভীর সন্ধ্যা—এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনী মেয়ে দুটি,—এই নবদম্পতী। দেখে মনেও হয় না এই পবিত্র স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে কলের কামান দিয়ে। বৃদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়।...অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতীর কত আশা, উৎসাহ।

এ্যালিস ঠিকই বলেছে। সব যাবে—কাল সকালেই হয়তো যাবে জাপানী বোমায়। পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে। লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতী যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি—সব যাবে। বৃদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায়।

ফুল-ছড়ানো শেষ হয়েছে। মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভর্ত্তি। নবদম্পতী তখন হাসছে—এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,—মৃত্যুর ওপর,—মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন্-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্ব্বাদ করুন।

এ্যালিস্ এসে বিমলের হাত ধরলো।

—চল যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটী রয়েছে—তোমার আমার এক্ষুনি—

—শেষ—